হামিদ। রহিম খাঁ? পাঠান দস্যু রহিম খাঁ কোথায়?

রহিম। রহিম খাঁ? হাঃ-হাঃ-হাঃ সে ব্যাটা কদিন হলো রাজার ভাণ্ডার লুট করে ভগবানগোলায় ছাউনি ফেলেছে।

হামিদ। সেকি! রহিম খাঁ পালিয়েছে? তাহলে সাহাজাদার আদেশটা—

রহিম। সাহাজাদার আদেশটা আমাকে দিয়েও জানতে পারেন। আমি যাচ্ছি ভগবানগোলায় রহিম খাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

হামিদ। কিন্তু আমি কে—কিসের আদেশ—আপনি জানলেন কি করে?

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি জানি রাজপুরুষ! ফকির হলেও দুনিয়ার কল্যাণে আমাকে অনেক কিছুই খবর রাখতে হয়।

হামিদ। তাহলে সাহাজাদার আদেশটা আপনি তাকে জানাতে পারবেন?

রহিম। কেন পারব না? আমি তার ধর্ম্মগুরু। বলুন—কি জানাতে হবে তাকে।

হামিদ। দিল্লীর আদেশ—যদি সে এই বিদ্রোহ বন্ধ করে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে সাহাজাদা এখন তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

রহিম। আর যদি বশ্যতা স্বীকার না করে?

হামিদ। তাহলে এই হাতিয়ার আর লোহার বেড়ি—এই দুটোর মধ্যে তাকে একটা বেছে নিতে হবে।

রহিম। বটে! আপনাদের সাহাজাদা দেখছি মস্তবড় জাল ফেলেছে। কিন্তু রহিম খাঁ—[চিন্তা করিয়া] হ্যাঁ হ্যাঁ—রহিম খাঁ বশ্যতা স্বীকার করতে পারে।

হামিদ। পারে?

রহিম। হ্যাঁ জওয়ান! কারণ এতে রহিম খাঁর লাভ।

হামিদ। লাভ?

রহিম। নিশ্চয়ই। সাহাজাদার মত বন্ধু পেলে ভবিষ্যতে তাকে আর ডাকাতি করতে হবে না।

হামিদ। ঠিক বলেছেন ফকির সাহেব! সাহাজাদার পক্ষেও রহিম খাঁর মত দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-শক্তিকে হাতে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

রহিম। শুধু তাই নয়। পিতামহ ঔরঙ্গজীব বুড়ো হয়েছেন। তাঁর কবর হলে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে একটা মহা হুলুস্থুলু পড়ে যাবে। এ সময়ে আফগান দস্যুবাহিনী যদি তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকে তাহলে শুধু বাংলা কেন হয়তো একদিন দিল্লীর মসনদও সাহাজাদার নসীবে ঘটে যেতে পারে।

হামিদ। ফকির সাহেবের দূরদৃষ্টি আছে দেখছি।

রহিম। তা ছাড়া মোগল আর পাঠান জাতিতে আলাদা হতে পারে, কিন্তু দেহের রক্ত তো আলাদা নয়।

হামিদ। তা তো বটেই—তা তো বটেই। তাহলে আমাদের কথাটা—

আজিমওশানের প্রবেশ।

আজিম। কিসের কথা হামিদ খাঁ?

হামিদ। এই ফকির সাহেব বলছেন রহিম খাঁ আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

আজিম। ফকির সাহেব কি জ্যোতিষী?

রহিম। না সাহাজাদা। আমি ফকির,—মানুষ ও ধর্ম্মের সেবা করাই আমার কাজ।

আজিম। সেটা দিনের বেলায়। কিন্তু রাত্রে কি করা হয়?

রহিম। তার মানে?

আজিম। আমি যদি বলি ফকির সাহেবের ঐ আলখাল্লার মধ্যে একখানা ছুরি লুকানো আছে?

রহিম। সাহাজাদা!

আজিম। আমি যদি বলি তুমিই বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহাত্রাস ডাকাত রহিম খাঁ?

হামিদ। সাহাজাদা! মিথ্যা সন্দেহে আপনি একজন ফকিরের নামে—

আজিম। না হামিদ, মিথ্যা সন্দেহ নয়। এই সেই আফগান দস্যুসর্দ্দার রহিম খাঁ।

হামিদ। রহিম খাঁ?

আজিম। হ্যাঁ হামিদ। বর্দ্ধমান-রাজবাড়ী থেকে গুপ্তচর এর পেছনে লেগে আছে। দিনের বেলায় এ পয়গম্বর সেজে মানুষকে বেহেস্ত পাঠায়, আর রাত্রে মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। মুখে এর ধর্ম্মের বুলি, কিন্তু অন্তরে রয়েছে খুনের নেশা। সোনা-দানার লোভে মানুষকে জবাই করতে এদের প্রাণ এতটুকু কাঁদে না।

রহিম। ডাকাতের প্রাণ কাঁদবে কেন? খুন করাই তো তাদের পেশা। কিন্তু তোমার পিতামহ ঔরঙ্গজীব? সে তো মানুষ। দিল্লীর সিংহাসনের জন্য বুড়ো সাজাহানকে বন্দী করতে তার চোখ দিয়ে ক'ফোঁটা জল পড়েছিল? আরবের তপ্ত মরুভূমিতে যখন একবিন্দু জলের জন্য দারা হাহাকার করেছিল—ক্ষিদের জ্বালায় ছেলেমেয়েদের হাত ধরে দোরে দোরে ভিক্ষে করেছিল, তখন তার পিছনে গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিতে ঔরঙ্গজীবের বুকখানা কতবার কেঁপে উঠেছিল?

আজিম। হুঁসিয়ার ডাকাত। [তরবারি নিষ্কাসন]

রহিম। হুঁসিয়ার সাহাজাদা! [তরবারি বাহির করিল]

[সকলের যুদ্ধ। রহিম খাঁর পলায়ন ও হামিদের পশ্চাদ্ধাবন।]

আজিম। পালাতে দিও না হামিদ। শয়তানের দেহে একফোঁটা খুন থাকতে ছেড়ে দিও না। পাঠানের খুনে বাংলার মাটি লাল করে দাও।

[নেপথ্যে হামিদ। শয়তান! এইবার জাহান্নামে যা—]

[নেপথ্যে রহিম। আঃ…আঃ]

আজিম। শেষ করে দাও! মাথা আন হামিদ খাঁ। পাঠান-বিদ্রোহীর মাথা নিয়ে আমি দিল্লীতে পাঠাব।

রক্তাক্ত হাতে রহিম খাঁর ছিন্নমুণ্ড লইয়া
হামিদ খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

হামিদ। এনেছি—এনেছি বিদ্রোহী ডাকাতের মাথা এনেছি সাহাজাদা।

আজিম। এনেছ? দাও—দাও, আমার হাতে দাও। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পাঠান বিদ্রোহীর মাথা বর্শার ফলকে গেঁথে দিল্লীতে পাঠাতে হবে। তাজা খুনে মোগলের জাতীয় পতাকা লাল করে তুলতে হবে!

হামিদ। জয় মোগলের জয়! জয় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৰ্দ্ধমান-রাজপ্রাসাদ

হাসিতে হাসিতে সত্যবতীর প্রবেশ।

[তাহার পরণে মূল্যবান শাড়ী। সমস্ত দেহ অলঙ্কারে ভরা। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট, হাসি খুশীতে মুখখানি ভরা যেন নব পরিণীতা বধূ]

সত্যবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি অলক্ষণ দেখ! রাজকন্যার ফুলশয্যা—আর সমস্ত বাড়ীটা যেন কান্নায় ভরে উঠেছে। কেন? নহবতের সুরটা বুঝি ভাল লাগছে না? আমার মুক্তি সন্ধ্যা—বসন্তের ডাক এসেছে! আমি কি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি? [কোকিলের কুহু-কুহু শব্দ] ঐ দেখ—খাঁচার কোকিলটাও আর্ত্তনাদ করছে! এদের সব হলো কি? আমার বরটা বুঝি পছন্দ হলো না? হাঃ-হাঃ-হাঃ না হোক্‌গে! আমি কি করব? তাই বলে রাজার মেয়ে হয়ে একটা পথের ভিখারীকে তো বিয়ে করতে পারিনে?

[নেপথ্যে সুভাসিংহ—"ওরে কে আছিস? প্রাসাদময় ফুল ছড়িয়ে দে—হাজার বাতির আলোগুলো জেলে দে—]

ঐ আমার বর আসছে! নারী জীবনের আশা আকাঙ্খার ডালি সাজিয়ে বসন্ত আসছে আমার দ্বারে। ওরে কোকিল! আর একবার ডাক না। ফুলশয্যার লগ্নটা মধুময় হয়ে উঠুক।

মত্তাবস্থায় সুভাসিংহের প্রবেশ।

সুভাসিংহ। এই, কে আছিস! আলো জ্বাল্! আবীর কুম-

কুমে সমস্ত বাড়ীটা রাঙিয়ে দে? পথে পথে ফুল ছড়িয়ে দে! আতর-গোলাপের গন্ধে—[সত্যবতীকে দেখিয়া] এই যে! তুমি তৈরী হয়েই এসেছ দেখছি। বাঃ—সুন্দর সেজেছ তো?

সত্যবতী। খুব ভাল লাগছে দেখতে—না?

সুভাসিংহ। খুব ভাল। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—

সত্যবতী। এই শ্মশান-পুরীটা স্বর্গ—আর আমি স্বর্গের পরী।

সুভাসিংহ। চমৎকার! একেবারে মনের কথাটা টেনে বার করেছ। জান সত্যবতী! তোমাকে যত দেখছি, ততই যেন আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য আমার মনে—না না—মনে বড় জ্বালা! বুকের মধ্যে তুঁষের আগুন! এত মদ খাচ্ছি তবু তো এ আগুন নেভাতে পাচ্ছি না?

সত্যবতী। আমি নিভিয়ে দেব। আমার ভালবাসার পরশ দিয়ে তোমার সব জ্বালা আমিই জুড়িয়ে দেব।

সুভাসিংহ। দেবে? আমার ছন্নছাড়া জীবনকে তুমি একটু সান্ত্বনা দেবে? তুমি কত সুন্দর! তোমার এই মহত্বের কাছে আমি সুভাসিংহ কত ছোট হয়ে গেছি। তবু আমার দুঃখ নেই! তোমাকে পাওয়ার আনন্দে—

সত্যবতী। কিন্তু পেতে হলে নিজেরও তো কিছু দিতে হয় রাজা!

সুভাসিংহ। দেব—দেব—আমার সব দেব। বল, কি চাও তুমি? ছোটবেলায় মা বাবাকে হারালাম—মধুর লোভে চারিদিক থেকে কু-সঙ্গীর দল এসে ঘিরে ধরল। ভেতরের মানুষটা হারিয়ে গেল, সত্য নির্ব্বাসিত হলো—মনুষ্যত্ব মরে গেল। মদ আর মেয়েমানুষের সঙ্গে কত বিচিত্র মানুষের হাট বসে গেল আমার আশেপাশে। জীবনটাকে আমি কি করে গড়ে তুলি বল তো সত্যবতী?

সত্যবতী। তুমি নিজে পারতে না। তোমাকে গড়ে তুলতে পারতো তোমার ভাই আর বোন।

সুভাসিংহ। ঠিক বলেছ। ওরাই পারতো আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে। কিন্তু হলো কই? বাধা যখন পেলাম, ঘুমন্ত মানবতাকে ওরা যখন আঘাত করতে লাগল, তখন যে আমি অনেক দূরে, বাঁধ ভাঙা জলের মত ছুটে চলেছি পাপের পঙ্কিলতা নিয়ে।

সত্যবতী। আর ভয় নেই। আমি যখন আছি, তখন আর তোমাকে ডুবতে দেব না।

সুভাসিংহ। তাই কর—তাই কর সত্যবতী! আমায় মানুষ করে তোল। সারা জীবনের সঞ্চিত পাপ আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আমায় মুক্ত কর—পাপের বিষকুম্ভ থেকে তুমি আমায় সরিয়ে আনো সত্যবতী। [কাঁদিয়া ফেলিল]

সত্যবতী। [জনান্তিকে আপন মনে] একি! আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি কেন? নারীর কোমলতায় তবে কি আমার সব ভেসে যাবে? না-না—তা হতে পারে না। ব্যর্থ জীবনের দু' ফোঁটা চোখের জলে— [চমকিয়া উঠিয়া পরে বলিল—] ওগো! এ প্রাণ তোমার এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? চোখ মেলে দেখ তো—এ পৃথিবী কত সুন্দর! অন্যায় এখানে ভালবাসার কাছে কত ছোট!

সুভাসিংহ। দেখছি—দেখছি—চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি। যত দুঃখ তোমাদের দিয়েছি—যত অত্যাচার তোমাদের ওপর করেছি —মানুষ হলে তুমি তা ভুলতে পারতে না। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও সত্যবতী! তুমি দেবী—তুমি স্বর্গের—

সত্যবতী। ও কথা আজ আর বলতে নেই। আমি তো হাসি-মুখে সব সহ্য করেছি।

সুভাসিংহ। তাইতো তুমি আমার কাছে এত বড়। তোমার ছোঁয়া লাগলে পাতকী উদ্ধার হয়—পাষাণ গলে যায় সত্যবতী। বলতে পার আমার কি আজ নূতন করে জন্ম হলো? নূতন করে চোখ ফুটলো? বহু জন্মের পাপ মুক্ত হয়ে আমি কি আজ সত্যই মানুষ হলাম সত্যবতী?

সত্যবতী। হ্যাঁ। তোমার জন্মের পাপ আজ মুছে গেল। শুনছো না প্রাসাদের চারিদিক থেকে কেমন আনন্দের সুর উঠছে? বসন্ত আসছে আমাদের মিলনের গান গেয়ে। এস, এগিয়ে এস। আমার হাত ধর। তোমার নব জীবনের সঙ্গিনী করে আমায় তুমি কৃতার্থ কর।

সুভাসিংহ। কিন্তু আমার ছোঁয়া গায়ে লাগলে যদি তোমার পাপ হয়, যদি তুমি ব্যথা পাও?

সত্যবতী। ওগো, না না! ব্যথা পাব না! যা পেয়েছি তাও ভুলে যাব। এস—আমায় গ্রহণ কর। মিলনের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। আর আমি দেরী করতে পাচ্ছি নে। এস—ওগো এস! [সুভাসিংহের পদতলে বসিয়া] আমার নারী জীবনের সব কিছু ঢেলে দিলাম তোমার পায়ে।

সুভাসিংহ। সত্যবতী! সত্যবতী! [অগ্রসর]

সত্যবতী। না-না—আমি কোন কথা শুনব না। আমায় বুকে তুলে নাও। আমি যে শপথ করেছি।

সুভাসিংহ। শপথ? কিসের শপথ?

সত্যবতী। শপথ করেছি—

সুভাসিংহ। বল—বল সত্যবতী! কিসের শপথ!

[বলিতে বলিতে সত্যবতীর হাত ধরিবার জন্য সুভাসিংহ যেমন নীচু হইল, সত্যবতী বস্ত্রাভ্যন্তরহইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা

বাহির করিয়া সুভাসিংহের কপালে আঘাত করিল
এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—]

সত্যবতী। রক্তের শপথ!

সুভাসিংহ। আঃ শয়তানি!

[বলিয়া সুভাসিংহও সত্যবতীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত
হইলে সত্যবতী পুনরায় তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা
দিয়া সুভাসিংহের বক্ষে আঘাত করিল]

সত্যবতী। যাও বাংলার মূর্ত্তিমান পাপ! বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মানুষের যত চোখের জল তুমি কেড়ে নিয়েছ—বুকের রক্তে যত হোলীখেলা করেছ, আজ তা নিজের জীবন দিয়ে শোধ করে যাও।

সুভাসিংহ। ছলনাময়ী! তোমার অন্তরে এত বিষ, তা যদি আগে জানতে পারতাম—

সত্যবতী। তাহলেও তোমার নিস্তার ছিল না। পাপ তোমার ষোল কলায় পূর্ণ, অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, মানুষের অভিশাপ পড়েছে তোমার মাথায়। মনে করেছিলে দস্যু, তোমার অত্যাচার চিরকাল এমনি ভাবেই চলবে? বাংলা কাঁদবে—তুমি হাসবে? বাংলার মাটিতে ঝরে পড়বে শত শত মানুষের চোখের জল—আর তুমি সেই ভিজে মাটির ওপর দিয়ে চালিয়ে যাবে তোমার অত্যাচারের রথ—তা হয় না দস্যু! কর্ণের রথের চাকা গ্রাস করতে নারায়ণকে চক্র ধরতে হয়েছিল, আর তোমার রথের চাকা বাংলার মেয়ে ছলনায় ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ…

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। রথের চাকা! ছলনায় ভেঙে—আঃ, মৃত্যু আসছে!

এক রাশ অন্ধকার নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! কে!…ওই বিরাট অন্ধকারের মধ্যে কে তুমি? একি বেদনার মূর্ত্তি! কাঁদছ কেন? কি চাও এই মৃত্যুপথ যাত্রীর কাছে? কি বললে, বাংলা মা! তোমার এই বেশ? দীন-হীনা মলিন বসন। কেন—কেন? কি বলছ?—আমার অত্যাচারে? ঠিক—ঠিক বলেছ। তাইতো আজ বিদ্রোহী সুভাসিংহ বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পা রাঙিয়ে গেল। দাও মা! দাও—তোমার পায়ে একটু ঠাঁই দাও।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

তীরধনুক হাতে রণসাজে উন্মাদ হিম্মত সিংহের প্রবেশ।

[কয়েক দিনের মধ্যে তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, চুল অবিন্যস্ত, কথাবার্ত্তায় যেন এলোমেলো ভাব। দূর হইতে অর্পণাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে।]

হিম্মত। অর্পণা! অর্পণা! হতভাগী গেল কোথায়? সেই কখন থেকে ডাকছি কিছুতেই সাড়া দেবে না? অর্পণা!—যাক গে! আমি একাই যাব! দাদার হাত থেকে আমি একাই রাজকন্যাকে—কিন্তু ওই হতভাগী সঙ্গে না থাকলে আমার যে হাত ওঠে না। শক্তি জোগাবে কে? পেছন থেকে উৎসাহ দেবে কে? মদের বোতল হাতে দিয়ে কে আমাকে—[আবার ডাকিল] অ—র্প—ণা—

[দূরে শুভাসিংহের ছায়মূর্ত্তি—"অ-র্প-ণা"—]

হিম্মত। একি! কান্নার আওয়াজ আসছে কোথা থেকে? কে কাঁদে?

[পুনরায় ছায়ামূর্ত্তির কণ্ঠস্বর—"অ-র্প-ণা"—]

হিম্মত। ওই আবার! এই দিকেই আসছে। কে—কে তুমি অদৃশ্য কণ্ঠস্বর? একি! ছায়ামূর্ত্তি! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? রাজ-কন্যাকে ছিনিয়ে আনতে দেবে না? তবে তোমাকে এই তীর দিয়ে—

[ধনুকে তীর যোজনা করিতে অসমর্থ হইল] আঃ—হাত কাঁপছে কেন? শক্তি কোথায় গেল? অর্পণা—

ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব।

ছায়ামূর্ত্তি। অর্পণা!—

হিম্মত। কে-কে তুমি? অর্পণার নাম ধরে ডাকছ কেন?

ছায়ামূর্ত্তি। আমি সুভাসিংহ।

হিম্মত। কোন সুভাসিংহ? আমার দাদা? একি মূর্ত্তি! কোথা থেকে আসছো?

ছায়ামূর্ত্তি। প্রেতলোক থেকে। বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মানুষের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে নিচ্ছি।

হিম্মত। কেন—কেন?

ছায়ামূর্ত্তি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

হিম্মত। কি হয়েছে তোমার?

ছায়ামূর্ত্তি। কালনাগিনী বর্দ্ধমান রাজকন্যা—

হিম্মত। বর্দ্ধমান-রাজকন্যা?

ছায়ামূর্ত্তি। ভালবাসার অভিনয়ে আমাকে হত্যা করেছে।

হিম্মত। হত্যা করেছে? বাংলার শত্রু সুভাসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজকন্যা—হাঃ-হাঃ-হাঃ—চমৎকার, চমৎকার প্রতিশোধ! ওরে অর্পণা! দেখে যা সত্যবতী আজ—

ছায়ামূর্ত্তি। অর্পণা কোথায়?

হিম্মত। অর্পণা? তুমি যেমন মুক্তির জন্য মানুষের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ,—সেও তেমনি মন্দিরে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে—"ভগবান! বাংলার মাটিতে আর যেন সুভাসিংহের জন্ম না হয়।"

ছায়ামূর্ত্তি। তবে আমার মুক্তি হবে না?

হিম্মত। না। এমনি করে তোমাকে যুগ-যুগান্তর কেঁদে বেড়াতে হবে। এক ফোঁটা জল পাবে না,—তৃষিত আত্মার করুণ আর্ত্তনাদে বাঙালীর ঘুম ভেঙে যাবে,—চোখ মেলে দেখবে,—অভিশাপ দেবে,—আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে বহু জন্মের ওপারে।

ছায়ামূর্ত্তি। তবে তাই হোক। অতৃপ্ত আত্মার সমস্ত বেদনা নিয়ে আমি জন্ম জন্ম ঘুরে বেড়াই, আর তোর কাছে রেখে যাই আমার পাপ দেহের এই জীর্ণ কঙ্কাল।

হিম্মত। কঙ্কাল? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[সহসা ছায়ামূর্ত্তির অন্তরাল হইতে একখানি মনুষ্যাকৃতি কঙ্কাল বাহির হইয়া হিম্মতের সম্মুখে দাঁড়াইল। হিম্মত তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।]

হিম্মত। ওগো বিদ্রোহী কঙ্কাল! বাংলার কত রক্ত তুমি খেয়েছ? বল—কথা কও? নইলে তোমাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে—[দুই হাতে চাপিয়া ধরিতে উদ্যত] হাঃ-হাঃ-হাঃ, কি বলছ? মুক্তি? কে দেবে? আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ না-না তোমার মুক্তি আমি দিতে পারব না। তোমায় মুক্তি দেবে বাংলার মানুষ—যারা তোমার অত্যাচারে শুধু চোখের জল ফেলেনি,—বুকের রক্ত ঢেলে লুটিয়ে পড়েছে তোমার পায়ের তলায়।

আলুথালু বেশে সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। বুকের রক্ত ঢেলে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। [কঙ্কালকে দেখিয়া] একি! এ কার কঙ্কাল?

হিম্মত। দেখতো চিনতে পার কি না? অবাক হয়ে কি দেখছ

নারি? তোমার হাতে এখনো রক্তের দাগ, মুখে রয়েছে প্রতিহিংসার চিহ্ন। দেখ—দেখ ভাল করে দেখ এ কার কঙ্কাল।

সত্যবতী। হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কোথায় পেলে?

হিম্মত। প্রেতলোক থেকে উড়ে এসেছে। নাড়ীর টান কিনা—তাই ভুলতে পারেনি।

সত্যবতী। নাড়ীর টান? তবে কি তুমি—

হিম্মত। সুভাসিংহের ভাই। বন্দিনীকে উদ্ধার করতে আজ আর বেদের ছদ্মবেশে নয়—স্বরূপ মূর্ত্তি নিয়ে বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাধা দিলে কঙ্কাল।

সত্যবতী। অর্পণা কোথায়? কেমন আছে?

হিম্মত। এই কঙ্কালকে জিজ্ঞাসা কর। ওই জানে তার সন্ধান।

সত্যবতী। না না—তুমি বল অর্পণা কোথায়? সে আমার জন্য জীবন দিতে গিয়েছিল,—তাকে দেখব বলে আমি একা ছুটে বেরিয়েছি প্রাসাদ থেকে। বল—বল অর্পণা কেমন আছে?

হিম্মত। বল বিদ্রোহী! কি উত্তর দেব? অর্পণাকে দেখবার জন্য বর্দ্ধমানের রাজকন্যা চেতোয়ার মাটিতে পা দিয়েছে—বল, কি বলব একে? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ? কি? তবু বলবে না? তবে এই চাবুকের আঘাতে তোমাকে আমি—[কঙ্কালকে প্রহারে উদ্যত]

সত্যবতী। মহাপুরুষ!

হিম্মত। না না—বাধা দিও না। এ আমায় সারাজীবন জ্বালিয়েছে। একটা বংশের সুনাম রসাতলে পাঠিয়েছে। একে আমি—[পুনরায় প্রহারে উদ্যত]

সত্যবতী। ছোট রাজা! কঙ্কালের গায়ে চাবুক মেরে জীবনকে ফিরে পাওয়া যাবে না! আমি বুঝতে পেরেছি অর্পণা নেই।—

হিম্মত। হ্যাঁ-হ্যাঁ—এই রাক্ষস তাকে খেয়ে ফেলেছে। অর্পণার বুকে যত রক্ত ছিল—এই কঙ্কাল সব চুষে খেয়েছে।

সত্যবতী। ওগো নিষ্ঠুর! এ তোমরা কি করলে? আমার জন্য শুধু একটা রাজবংশই নয়—অর্পণার মত জীবনকেও বাংলার মাটি থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিলে?

হিম্মত। ভগবানের ন্যায়দণ্ড মানুষ বিচার করে না রাজকন্যা। তাই আমাদের অপরাধে অর্পণাকে জীবন দিতে হলো।

সত্যবতী। তবু আমি শান্তি পাচ্ছি না কেন? প্রতিহিংসা পূর্ণ হলো,—তবু আমার মনের হাহাকার থামলো না কেন? চারিদিকে একি শূন্যতা! কেউ নেই—কিছু নেই!

হিম্মত। কে বলে তোমার কেউ নেই? অভিশপ্ত রাত্রির শেষে তুমি আজ মুক্তির আলো এনে দিয়েছ,—ভয়ার্ত্ত মানুষের চোখে দিয়েছ মুক্তির কাজল,—হাতে দিয়েছ মুক্তির মশাল,—কণ্ঠে দিয়েছ মুক্তির জয়গান। হাজার হাজার মানুষকে তুমি আপনার করে নিয়েছ।

সত্যবতী। তবু এ মুক্তির আনন্দ আমার কাছে আজ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ওগো বিদ্রোহী-ভ্রাতা! মাটির কান্না হয় তো একদিন থেমে যাবে,—কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীতে যে কান্নার সুর উঠেছে—তা বুঝি কোনদিন থামবে না।

হিম্মত। থামতে পারে না। যুগ যুগ ধরে দেওয়াল ফেটে এ কান্না বেরিয়ে আসবে। তবু ওগো মুক্তিদাত্রী! সব হারিয়ে তুমি যা বাংলাকে দিয়ে গেলে,—বাংলার মানুষ তা কোনদিন ভুলবে না। এইবার চল রাজকন্যা! তোমাকে রাজবাড়ীতে রেখে আসি।

সত্যবতী। কি নিয়ে আর-ফিরে যাব? বাবা নেই, মা নেই—ভাই দাদা সবাই নিহত। ও শ্মশান-মন্দিরে কি দেখতে যাব?

হিম্মত। দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না? যারা চলে গেল তাদের স্মৃতির তর্পণ করবে না?

সত্যবতী। করব,—তবে তা চোখের জলে নয়—বুকের রক্তে।

হিম্মত। রাজকন্যা!

সত্যবতী। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরি বাহির করিয়া] এই দেখ সেই ছুরি—

হিম্মত। রাজকন্যা!

সত্যবতী। যার একটা আঘাতে বিদ্রোহীকে শেষ করেছি। পার—পার এই ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দিতে? আমার রক্ত নিয়ে বিন্দু আর অর্পণার স্মৃতির তর্পণ করতে?

হিম্মত। না না,—পারব না রাজকন্যা।

সত্যবতী। আমি পারব। যে হাতে তোমার দাদাকে মেরেছি—সেই হাতে আমার বুকেও ছুরি বসাতে পারব। [ছুরি নিজের বুকের উপর উদ্যত করিয়া] এই দেখ।—কি শক্ত করে ধরেছি। হাত কাঁপছে না—দেখ—দেখ—

হিম্মত। উন্মাদিনী। সর্ব্বনাশ করো না। [বাধা দিতে অগ্রসর]

সত্যবতী। সরে যাও! নইলে বিদ্রোহীর ভাই তুমি—তোমাকেও আমি বাঁচিয়ে রাখব না। এই ছুরি দিয়ে—

হিম্মত। তাই কর—তাই কর সত্যবতী! আমার রক্ত নিয়ে শত শহীদের তর্পণ কর—তুমি চলে যেও না—তোমার জন্মকে ব্যর্থ হতে দিও না—তোমার কীর্ত্তিকে ম্লান হতে দিও না।

[সত্যবতীর উদ্যত ছুরির সামনে বুক পাতিয়া দাঁড়াইল]

সত্যবতী। তবে তাই হোক্। দাঁড়াও বিদ্রোহী-ভ্রাতা! যে ছুরি সুভাসিংহের রক্তপান করেছে—সেই ছুরি আজ তোমার বুকেও—

[হিম্মতকে হত্যা করিতে দুই পা আগাইয়া গিয়া সত্যবতী থমকিয়া দাঁড়াইল এবং বিরাট অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িল।]

সত্যবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হিম্মত। এস! এস! থম্‌কে দাঁড়ালে কেন? এস, আমার রক্তে দাদার প্রায়শ্চিত্ত হোক্‌,—অর্পণার আত্মা শান্তি লাভ করুক,—তোমার রক্তের শপথ পূর্ণ হোক্‌।

সত্যবতী। প্রায়শ্চিত্ত!…শান্তি!…রক্তের শপথ!…হাঃ-হাঃ-হাঃ—তবে তাই হোক্‌…তাই হোক্‌—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাসিতে হাসিতে নিজের ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দিল। হিম্মত ছুটিয়া গিয়া সত্যবতীকে ধরিল]

হিম্মত। সত্যবতী! একি করলে? একি করলে?

সত্যবতী। শপথ পূর্ণ হলো, দেনা-পাওনা শোধ—বিদ্রোহের অবসান!

দূরে আজিমওশান ও জবর খাঁর প্রবেশ।

জবর। ঐ—ঐ দস্যু সুভাসিংহ রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! গুলি করুন—গুলি করুন শাহাজাদা—

আজিম। শয়তান। [হিম্মতকে গুলি করিল]

হিম্মত। আঃ…

সত্যবতী। কে মারলে? কে মারলে? ওগো এমন সর্ব্বনাশ কে করলে?

দ্রুত জগত রায়ের প্রবেশ।

জগত। সত্যবতী! সত্যবতী! আমরা এসেছি। একি। রক্ত? কে মারলে তোকে?

সত্যবতী। নিজের বুকে নিজেই ছুরি মেরেছি! কিন্তু দাদা! এ তোমরা কি করলে? মনে প্রাণে যে বর্দ্ধমান রাজবংশকে বাঁচাতে চেয়েছিল—যে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার নারীত্বকে রক্ষা করেছে—তাকে তোমরা গুলি করলে?

আজিম। সেকি! এ তবে সুভাসিংহ নয়?

জগত। না—না,—এ সুভাসিংহের ভাই। ওগো শাহাজাদা! এত বড় উপকারী বন্ধুকে—ওঃ! একি করলে? সত্যবতী! সত্যবতী!

সত্যবতী। আর ডেক না দাদা! বাবা ডাকছে! বর্দ্ধমান ডাকছে! সেই মাটির ডাক—রক্তের ডাক, আমি যাই—সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবা! বাবা—

[প্রস্থান।

হিম্মত। সত্যবতী! সত্যবতী! আলো নিভে গেল। জীবনের দেনা-পাওনা শোধ করে তুমি চলে গেলেও বাংলার ইতিহাস থেকে তুমি কোনদিন মুছে যাবে না। [প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া] আর তুমি কঙ্কাল? তোমাকে কি করব? তুমি একটা দেশকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ,—সমস্ত দুনিয়ার কাছে একটা জাতির পরিচয় কলঙ্কিত করেছ। চল,—চেতোয়ার উন্মুক্ত রাজপথে পাথরের বেদীতে তোমায় গেঁথে রাখব। পথের যাত্রী তোমায় দেখবে,—ভয়ে শিউরে উঠবে,—আমরণ তোমার বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে তারা তোমায় ধিক্কার দেবে।

[কঙ্কাল লইয়া প্রস্থান।

জবর। জগতরাম! ভাই একি হলো? যে বহিনকে বাঁচাবার জন্যে আমরা এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা করলাম—সে আশা আমাদের পূর্ণ হলো না। ওঃ খোদা। একি করলে?

আজিম। দুঃখ করো না ভাই! এ শুধু তোমাদের দুর্ভাগ্য নয়।

চেয়ে দেখ, বাংলার সমস্ত মানুষ আজ তোমাদের দুঃখে চোখের জল ফেলছে। চল কুমার! বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। বর্দ্ধমানের বুকে আবার শান্তির পতাকা তুলে ধরি! বাংলার ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে —বাংলার নবাব যা পারেনি—সেই বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিল বর্দ্ধমানের রাজকন্যা সত্যবতী নিজের জীবনের বিনিময়ে এক অভিনব বাসর রচনা করে—তার নাম—"মৃত্যু-বাসর"।

———

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নাটকাবলী

ঝান্সীর রাণী (ঐতিহাসিক নাটক) অম্বিকা নট্ট কোং অভিঃ মূল্য ৩॥৹
প্রবীরার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
রক্ত-তিলক (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
চাঁদের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
বাঁশের বাঁশী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
রাজলক্ষ্মী (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
সারথি (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
স্বামীর ঘর (দেশাত্মবোধক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিঃ। মূল্য ৩॥৹
সত্যাশ্রয়ী (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
রাজ-নন্দিনী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
মায়ের ডাক (রূপক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
দেবতার গ্রাস (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
রাজ-সন্ন্যাসী (ঐতিহাসিক নাটক) বিল্বগ্রাম নট্ট কোংতে „ মূল্য ৩॥৹
স্বর্ণলঙ্কা (পৌরাণিক নাটক) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
ভক্তকবি জয়দেব (ঐতিহাসিক নাটক) নট্টকোংতে অভিঃ মূল্য ৩॥৹
দানবীর (পৌরাণিক নাটক) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
জনতার মুকুট (ঐতিহাসিক নাটক) অম্বিকা নাট্য কোং। মূল্য ৩॥৹
ভৈরবের ডাক (ঐতিহাসিক নাটক) ভারতী অপেরায় অভি মূল্য ৩॥৹
চাষার ছেলে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিঃ। মূল্য ৩॥৹
গাঁয়ের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) সত্যনারায়ণ অপেরায় „ মূল্য ৩॥৹
ভারত-তীর্থ (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
বিচারক (ঐতিহাসিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩॥৹
কুরুক্ষেত্রের আগে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে „ মূল্য ৩॥৹
রক্তের আলপনা (পৌরাণিক নাটক) আর্য্য অপেরায় „ মূল্য ৩॥৹

মৃত্যু-বাসর

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
কুণ্ডু নাট্য কোম্পানী কর্ত্তৃক অভিনীত।
[বহু নাট্য প্রতিযোগীতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

১৩৬৭ সাল।

তৃতীয় সংস্করণ।]

॥ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ॥

মহাতীর্থ কালীঘাট—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত, কালিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত। এই নাটকে দেখতে পাবেন—একান্ন পীঠের অন্যতম মহাপীঠ মহাতীর্থ কালীঘাটের সৃষ্টি রহস্য। নীলগিরি পর্ব্বতে ব্রহ্মানন্দ গিরির কঠোর তপস্যায় মায়ের আবির্ভাব হ'লো শিলারূপে সুরধুনীর তীরে—যেখানে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলির পাশে সদা জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন নকুলীশ ভৈরব। তারপর? সেবায়েতের গদী নিয়ে হলো কাড়াকাড়ি। রাজা বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে হলো রুদ্রযামলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। রক্তলোলুপা মা হলেন "গৃহীর মা"। সর্ব্বকালের মহাকীর্ত্তিমণ্ডিত এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর নাট্য রূপায়ণ এই মহাতীর্থ কালীঘাট। পড়ুন, অভিনয় করুন। **বাপ্পাদিত্য**।

রক্ত পিপাসা—উদীয়মান নাট্যকার শ্রীমণীন্দ্রমোহন দে রচিত বর্ত্তমান যুগের সার্থক কাল্পনিক নাটক। মানুষ যে কতদূর বিষধর হতে পারে, এ তারই প্রতিচ্ছবি। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা আর লাঠির ঘায়ে রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল দেশের মাটি। তারপর? "লাঠি যার মাটি তার" এই প্রবাদ বাক্য সার্থক হয়। সার্থক করে নাট্য কৌতূহল ও ঘাত-প্রতিঘাত; সুনাম অর্জ্জন করে প্রতিটি অভিনয়ে।

জ্বলন্ত প্রাসাদ—নগেন্দ্রনাথ মাইতি প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। যুগে যুগে ঘটে চলেছে মানুষ ও অমানুষের বিচিত্র সংঘাত। যে সংঘাতে বয়ে যায় রক্তের ধারা, আর সেই রক্তের ধারায় মানুষের বিচিত্র সৃষ্টি তলিয়ে যায়—নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যার জন্য রাজার ছেলে হয়েছে নামজাদা দস্যু, বিশস্ত কর্ম্মচারীর স্বার্থপরতায় রাজা হয়েছে সর্ব্বহারা, জাতিদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহীর বিষাক্ত দংশনে পিতাও যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, জাতি-ধর্ম্মের বনিয়াদ যখন ধ্বংস করতে লাগল, তখনই জ্বলন্ত প্রাসাদ বুঝিয়ে দিলে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মে ভয়াবহ।" **বাঁদীর হাট**।

মাটি কেন লাল?—অনিলকুমার দাসের জনচিত্তজয়ী কাল্পনিক নাটক। কার অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়? কে ঐ দুরন্ত রাক্ষস রক্তের নেশায় উল্কার ন্যায় বিচরণ করছে? কে ঐ নরদেহধারী জীবন্ত শয়তান, যার বিকট গর্জ্জনে বসুধার মাটি থর থর করে কাঁপে? কেন বয়ে যায় শান্তির সাম্রাজ্যে রুধিরের স্রোত? অভিযোগকারীগণ কার কাছে প্রশ্ন করে—এ দেশের "মাটি কেন লাল?"

স্ত্রী ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক—পকেটমার, মজদুর, পিস্তল, পাপের পরিণাম

বসিরহাট মহকুমার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম

ধারক ও বাহক

কবি সাহিত্যিক

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-রত্ন, বিদ্যাবিনোদ

মহাশয়ের করকমলে—

—— * ——

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমলে বাংলা বর্দ্ধমানের বুকে পাঠান বিদ্রোহের অগ্নিদাহে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল,—এবং বর্দ্ধমান রাজ-দুহিতার আত্ম বলিদানে বাংলার মাটি পবিত্র হয়েছিল—তারই পটভূমিকায় রচিত এই 'মৃত্যু-বাসর'।

বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যার নামটি দীর্ঘ এক বৎসর ধরে চেষ্টা করেও জানতে পারি নি। তাই কাল্পনিক "কৃষ্ণা" নামেই আজও "কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীতে" অভিনয় হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকদিন আগে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" অনুকম্পায় ও সহায়তায় নামটি "সত্যবতী" বলেই জানতে পেরেছি। সেই সূত্রে নাটকে কৃষ্ণার বদলে "সত্যবতী নামটিই সংযোজন করলাম। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে" আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীর নাট্য-পরিচালক নটনায়ক শ্রীবিজন কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহ শিল্পীবৃন্দকেও এই নাটকের সার্থক রূপদানের জন্য ধন্যবাদ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

চরিত্র লিপি

—পুরুষ—

রাজা কৃষ্ণরাম রায়	...	...	বর্দ্ধমান অধিপতি।
জগত রাম	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
রাজারাম	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
সৌবীর্য্য	...	...	ঐ সেনাপতি।
সুভাসিংহ	...	...	চেতোয়া-বর্দ্দোয়ার জমিদার।
হিম্মত সিংহ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
রহিম খাঁ	...	...	বাংলা বিহার উড়িষ্যার পাঠান দস্যুসর্দ্দার।
জবর খাঁ	...	...	বাংলার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁর পুত্র।
আজিম ওশান	...	...	দিল্লীশ্বরের পৌত্র।
হামিদ খাঁ	...	...	ঐ সহচর।
দণ্ডধর চূড়াধর গুয়ে	...	...	পল্লীবাসীগণ।

—স্ত্রী—

সত্যবতী	...	...	বর্দ্ধমানের রাজকন্যা।
অর্পণা	...	...	সুভাসিংহের ভগিনী।
বিন্দুবাসিনী	...	...	দণ্ডধরের স্ত্রী।

নর্ত্তকীগণ।

॥ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ॥

বাদশা বাঁদী—শিবাজী রায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। রাজ্যশাসনের ক্ষুধার অনলে কাতর হয়ে মেবারের পথে পথে জ্বলে উঠলো লক্ষ লক্ষ শ্মশান চিতা···তবুও শেষ হল না পররাজ্যলোভী তুর্কীর রাজ্যলিপ্সা। হলদিঘাট রণপ্রান্তরে দেশপ্রেমের পরীক্ষায় কে হলো জয়ী? কোন সে বাঁদী, যে মুক্ত করে দিলে শক্তসিংহের কারাবাস? কোন্ সে বাদশা, যার মহলে বাঁদীই ছিল মন্ত্রণাদাতা? নাটকীয় উপাদানে প্রতি দৃশ্যে দৃশ্যে শিহরণ ও প্রশ্ন। যাত্রা নাট্য-সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

পদ্মদীঘির মেয়ে—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক রচিত কাল্পনিক নাটক। দারিদ্র্যতাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে চরম অভিশাপ। আর তারই চাপে পড়ে সরল সচ্চরিত্র মানুষও ক্রমে পরিণত হয় গরলে। এ নাটকের নায়ক মদনলাল সেই চাপে পড়ে যাত্রা করেছিল এক পাপপথে; কিন্তু নায়িকা পদ্মদীঘির মেয়ে কুন্তলা কি ভাবে সেই পাপের পথ থেকে মদনকে ফিরিয়ে আনলো তারই অভিনব আলেখ্য। এতে দেখবেন—ডালিয়ার দ্বিমুখী সংঘাত, শঙ্কর ও মোহিনীর স্বর্গীয় প্রেম, নেপথ্য চরিত্র মোহর ডাকাতের ভয়াবহ বিভীষিকা—সব কিছু মিলে নির্য্যাতিত বুভুক্ষু মানবাত্মার এক রহস্যময় নাটক এই "পদ্মদীঘির মেয়ে"। অল্পলোকে সহজে জমজমাট নাটক। **দেনাপাওনা, জীবন্ত পাপ।**

লৌহ প্রাচীর—ব্রজেন দের অতুলনীয় সামাজিক নাটক। "স্বাধীন দেশের পুলিশ হবে সত্যের পূজারী"—প্রধানমন্ত্রীর এই বাণী লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ভুলে গেলেও, ভোলে নাই দারোগা সত্যকিঙ্কর। খুনের তদন্ত করতে গিয়ে দারোগা দেখলেন, খুনী তাঁরই ছেলে। তারপর? খুনীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে দারোগার অক্লান্ত চেষ্টা কি সফল হয়েছিল? স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, সহকর্ম্মিগণ কেউ কি তাকে ফেরাতে পারেনি? পুত্রবধূর সাবিত্রী নাম কি ব্যর্থ হয়ে গেল? এর উত্তর পাবেন এ নাটকে।

এক মুঠো আগুন—শিবাজী রায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। এক মুঠো অন্ন থেকে যারা মানুষকে বঞ্চিত করেছে, তাদের মুখে কে দেবে এক মুঠো আগুন? এই প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই এই নাটক। ভাষা, ভাব ও কাহিনী এতই মধুর যে, পড়তে আরম্ভ করলে শেষ পাতা পর্য্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হবে। অভিনয় দেখতে গেলে যবনিকা পর্য্যন্ত না দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না পড়ুন, অভিনয় করুন।

স্ত্রী বর্জ্জিত নাটক—ফেরিওয়ালা, নিষ্পত্তি, দায়ী কে? পূজা বিভ্রাট

মৃত্যু-বাসর

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দির প্রাঙ্গণ।

গ্রাম্যবালিকাগণের নৃত্যগীত সহ প্রবেশ।

গ্রাম্যবালিকাগণ।—

গীত।

আমার সোনার বাংলা দেশ
তোমায় নমঃ তোমায় নমঃ, নমো নমঃ।
স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া-ঘেরা মায়ায় অনুপম—
তোমায় নমঃ তোমায় নমঃ নমো নমঃ।
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী
দীঘির জলে ছায়া তাহার ওঠে ভাসি,—
গাঁয়ের মেয়ে একলা ঘাটে পদ্ম ফুলের সম,
তোমায় নমঃ তোমায় নমঃ নমো নমঃ।

রক্তাক্ত কলেবরে ছুটিতে ছুটিতে ভিখারীর ছদ্মবেশে হিম্মত সিংহের প্রবেশ।

হিম্মত। ডাকাত! ডাকাত! পালাও—পালাও—ডাকাত আসছেন!

গ্রা-বা-গণ। ডাকাত? এই দিন দুপুরে?

হিম্মত। হ্যাঁ গো মা-লক্ষ্মীরা! শীগ্‌গীর পালাও—রাজাকে খবর দাও! নইলে এক্ষুনি তোমাদের সব কেড়ে নিয়ে যাবেন গো!

১ম বা। ওরে বাবারে! কি সর্ব্বনাশ! চল্—চল্ পালাই চল্।

সকলে। ডাকাত! ডাকাত!—

[চীৎকার করিতে করিতে বালিকাগণের প্রস্থান।

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ মেরেছি তীর। ঠিক লাগবে! বুকে গিয়ে লাগবে! আমার লক্ষ্যভেদ ব্যর্থ হবে না—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

তরবারি হাতে সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। কই—কোথায় ডাকাত? কোথায় ডাকাত?

হিম্মত। রাজবাড়ীতে গো—এক্ষুনি পড়বেন!

সৌবীর্য্য। কি করে জানলে?

হিম্মত। আমাকেও ধরেছিলেন—কিন্তু অতিকষ্টে পালিয়ে এসেছি। এই দেখ না গো—লাঠির ঘায়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছেন? [কাঁদিয়া ফেলিল]

সৌবীর্য্য। তুমি কে?

হিম্মত। ভিখারী বাবা, ভিখারী। চেতোয়ায় বাড়ী। আমার ভিক্ষের সম্বল একমুঠো চাল আর গোটাকতক পয়সা কেড়ে নিয়ে ব্যাটা বললেন—

সৌবীর্য্য। কি বল্‌লে?

হিম্মত। বল্‌লেন আমরা রাজবাড়ীতে ডাকাতি করতে যাচ্ছি।

সৌবীর্য্য। তারপর?

হিম্মত। তারপর আমিও কোনরকমে ফাটা মাথা চেপে ধরে ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্! ছুটতে ছুটতে এলাম তোমাদের খবর দিতে।

সৌবীর্য্য। ডাকাতটাকে চিনতে পারলে না?

হিম্মত। চিনব কি করে? মুখে সব 'ভাব' বাঁধা! তবে মনে হয় ঐ শালা নাক-কাটা রহিম খাঁ—উড়িষ্যার আফগান দস্যু-সর্দার—যে মাঝে মাঝে আমাদের এই বাংলা দেশে এসে লুট-তরাজ করেন—সেই ব্যাটা।

সৌবীর্য্য। সঙ্গে কত লোক দেখলে?

হিম্মত। লোক কি আর দেখতে পেলাম? তারা বোধ হয় জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন।

সৌবীর্য্য। ঠিক বলেছ। দস্যুদলপতি রহিম খাঁর অত্যাচারে শুধু উড়িষ্যা নয়,—বাংলার মানুষও আজ উৎপীড়িত। তার ওপর আমাদের চিরশত্রু চেতোয়ার জমিদার সুভাসিংহও—

হিম্মত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ কত্তা! ঐ সুভাসিংহও রহিম খাঁর সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছেন।

সৌবীর্য্য। এ গাঁট-ছড়া বেশীদিন থাকবে না। এস ভিক্ষুক! এই বিপদের খবর দিয়ে তুমি আজ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের যে উপকার করলে—তার বিনিময়ে তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেব।

হিম্মত। না-না—এখন নয়। আগে ডাকাত ধরা পড়ুক—তারপর চেয়ে নেব আমার পুরস্কার। আপনি যাও গো—শীগ্‌গীর রাজাকে খবর দাও। সাবধান! ডাকাত যেন পালিয়ে না যায়! ছদ্মবেশে আসবেন কিন্তু! ধরা চাই—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

সৌবীর্য্য। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

হিম্মত। ঐ মন্দিরের মধ্যে। ডাকাত ধরা পড়লে তখন আসব পুরস্কার নেব—মনের মত পুরস্কার—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দ্রুত প্রস্থান।

সৌবীর্য্য। শয়তান রহিম খাঁ! একবার যদি তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে পাই—তাহলে শুধু তোমার দস্যুতার শেষ করে দেব না, ওই সঙ্গে চেতোয়ার জমিদার সুভাসিংহকেও এমন শাস্তি দেব—যার কথা স্মরণ করলে শতাব্দীর পরেও বাংলার মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

[প্রস্থান।

জগতরাম ও দূতবেশী সুভাসিংহের প্রবেশ।

জগত। এস দূত? বল—কি সংবাদ পাঠিয়েছেন সুভাসিংহ?

সুভাসিংহ। তিনি বর্দ্ধমান-অধিপতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছেন—অতীতের সমস্ত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে আসুন আমরা একসঙ্গে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

জগত। বেশ—বেশ সুখের কথা। চেতোয়া-বর্দ্দোয়ার সঙ্গে আমাদের চিরকালের বন্ধুত্ব—সেটা অটুট রাখতে অতীতের সমস্ত বাদ-বিসম্বাদ আজ যে সুভাসিংহ ভুলে যেতে চান,—এ সংবাদে বাবা খুবই খুশী হবেন।

সুভাসিংহ। খুশী হবারই কথা। কারণ এতকালের মনোমালিন্য আজ শেষ হতে চলেছে—

জগত। তাতো বটেই—তাতো বটেই!

সুভাসিংহ। তিনি আরও জানিয়েছেন—এই বন্ধুত্বকে চিরস্মরণীয় করতে বর্দ্ধমানের সঙ্গে চেতোয়ার একটা মিলনের রাখী-বন্ধন হওয়া উচিত।

জগত। বাঃ—বাঃ চমৎকার চমৎকার। তাহলে তো খুব ভাল হয়।

সুভাসিংহ। সেই রাখীবন্ধনের আগে তাই আমার প্রভু সুভাসিংহ রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ একটা মঙ্গল ঘট পাঠিয়েছেন।

জগৎ। তাই নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, কই দেখি—দেখি।

সুভাসিংহ। এই যে কুমার! এই সেই মঙ্গল ঘট।

[সুভাসিংহ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছোট মঙ্গল ঘট বাহির করিল। জগতরাম তাহা শ্রদ্ধাভরে দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল]

জগত। সুন্দর! সুন্দর! এইতো চাই! বন্ধুত্বের নিদর্শন এর চেয়ে আর কি হতে পারে?

সুভাসিংহ। তিনি ওই মঙ্গলঘটের মধ্যে একখানা পত্রও দিয়েছেন।

জগত। পত্র? কই দেখি!

[খুব আগ্রহ সহকারে জগতরাম ঘটের মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহা হাসিমুখে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার হাসিমুখ ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া যেন আগুনের ফুল্‌কী বাহির হইতে লাগিল। জগতরাম গর্জ্জন করিয়া সুভাসিংহের উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল]

জগত। শয়তান! দস্যু! ডাকাত!—

দ্রুত কৃষ্ণরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণরাম। কই, কোথায় ডাকাত—কোথায় ডাকাত জগতরাম?

জগত। ডাকাত এই দূত,—ডাকাত সুভাসিংহ,—বর্দ্ধমানের পবিত্র রাজবংশের মান-মর্য্যাদা ডাকাতি করতে এসেছে।

কৃষ্ণরাম। সেকি!

জগত। হ্যাঁ বাবা! দূতের ছদ্মবেশে ডাকাত এসেছে। সরে আসুন—ওর সামনে যাবেন না,—ওর বুকের মধ্যে ছুরি লুকানো রয়েছে।

কৃষ্ণরাম। কি বলছো পাগলের মত? [দূতকে] সত্য বল—কে তুমি?

সুভাসিংহ। সুভাসিংহের দূত।

কৃষ্ণরাম। কি জন্য এখানে এসেছ?

জগত। পড়ুন এই পত্র। দেখুন—ওর মধ্যে কি বিষের জ্বালা।

[জগত কৃষ্ণরামের হস্তে পত্র দিল। কৃষ্ণরাম পত্র পড়িয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল]

কৃষ্ণরাম। সুভাসিংহ।

জগত। বন্দী করুন বাবা—দূতকে বন্দী করুন।

কৃষ্ণরাম। না-না বন্দী নয় জগতরাম। একে প্রকাশ্য রাজপথে চাবুক মারতে মারতে বর্দ্ধমানের সীমানা পার করে দিয়ে এস।

সুভাসিংহ। মহারাজ বড় উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি।

জগত। চুপ্! একটা কথা নয়।

কৃষ্ণরাম। মাথাটা নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছো—এই তোমার সৌভাগ্য।

সুভাসিংহ। ইচ্ছা হয়—মাথাটা কেটে নিন না।

কৃষ্ণরাম। যে পত্র নিয়ে তুমি এখানে এসেছ—তাতে তোমার মাথাটা কেটে নিলে সে অপমানের শোধ হবে না,—সেই সঙ্গে তোমার প্রভু সুভাসিংহের জিব্‌টা ছিঁড়ে নেওয়া উচিত।

সুভাসিংহ। কেন? প্রভু কি অন্যায় কিছু বলেছেন?

জগৎ। অন্যায় নয়? ক্ষুদ্র একটা তালুকদার বিদেশী আফগান দস্যুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে তার স্বজাতি স্বদেশের সর্ব্বনাশ করতে চায়,—তার হাতে রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মেয়েকে তুলে দেওয়ার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে দামোদরের জলে ফেলে দেওয়া ঢের ভাল।

সুভাসিংহ। ক্ষুদ্র তালুকদার হলেও সুভাসিংহ বোধহয় মান-মর্য্যাদার দিক থেকে রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের চেয়ে কোন অংশে কম নন। আর আফগান-দস্যুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন স্বদেশের সর্ব্বনাশ করতে নয়,—

কৃষ্ণরাম। তবে?

সুভাসিংহ। মোগলের দাসত্ব থেকে বাংলার মাটিকে মুক্ত করতে।

কৃষ্ণরাম। সেই দস্যু—যে উড়িষ্যার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে,—যার ভয়ে মায়ের কোলে শিশুও আঁতকে ওঠে,—যে বাংলার মূর্ত্তিমান অভিশাপ, হত্যায় লুণ্ঠনে যার দস্যুবাহিনী আজ বাংলা-বিহার উড়িষ্যার বিভীষিকা!

সুভাসিংহ। মোগলের উদ্ধত মাথা নুইয়ে দিতে সুভাসিংহ যদি আফগান দস্যুপতি রহিম খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপরাধ করে থাকেন,—তাহলে আমি বলব মোগলের দাসত্ব শৃঙ্খল পরে বর্দ্ধমানরাজ তাঁর চেয়েও বেশী অপরাধী।

জগত। সেটা আমরা বুঝব,—তার জন্য সুভাসিংহের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সুভাসিংহ। সুভাসিংহের দরকার না থাকলেও বাংলার সাত-

কোটী মানুষের জন্ম দরকার আছে। কারণ মোগলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটিতে আবার লাল-মুখের আমদানি হয়েছে। তাই সুভাসিংহ চেয়েছেন অতীতের সমস্ত বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে—

কৃষ্ণরাম। রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে?

সুভাসিংহ। আর তাঁর মেয়েকে—

কৃষ্ণরাম। সুভাসিংহের হাতে তুলে দিয়ে সেই বিদ্রোহের আগুনে আরও খানিকটা ঘি ঢেলে দিতে।

সুভাসিংহ। তাহলে এ বিবাহে আপনি সম্মত নন?

জগত। আবার জিজ্ঞাসা করছো?

কৃষ্ণরাম। একটা দুশ্চরিত্র মাতাল জমিদারের হাতে—

সুভাসিংহ। মহারাজ!

কৃষ্ণরাম। চুপ্।

সুভাসিংহ। আমার সামনে আমার প্রভুর নিন্দা করবেন না।

কৃষ্ণরাম। তবে কি ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করব? ওই মঙ্গলঘট ভরে বিষ নিয়ে যাও দূত! তোমার প্রভুকে দিয়ে বলো—বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমি তাকে দিয়েছি বিষ।

জগত। সে বিষ খেয়ে সুভাসিংহ যদি আত্মহত্যা করে—তাহলে দূর থেকে আমরা হরির লুট দেব।

সুভাসিংহ। আত্মহত্যার পরেও সুভাসিংহের প্রেতাত্মা আসবে তোমাদের বুকের রক্ত পান করতে—এ কথা যেন মনে থাকে বর্দ্ধমান রাজকুমার!

[প্রস্থানোদ্যত।

জগত। তার আগে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে সুভাসিংহের প্রেতাত্মা যাতে আর বাংলার বুকে নূতন করে জন্ম নিতে না পারে,—তার ব্যবস্থাও করব।

সুভাসিংহ। সে জন্মকে ব্যর্থ করা অতটা সহজ নয় রাজকুমার! সুভাসিংহ আসবে, জন্মান্তর পরেও আসবে! সহজে যদি না দাও —তাহলে জোর করে কেড়ে নেবে বর্দ্ধমানের পরমাসুন্দরী কন্যাকে।

[পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণরাম। কোন জন্মেই তা সম্ভব হবে না দূত!

সুভাসিংহ। এই জন্মেই দেখতে পাবেন। অচিরেই বর্দ্ধমান-রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে সুভাসিংহ তার অতুল ঐশ্বর্য্য লুটে নিয়ে যাবে আর সে লুটের প্রধান সামগ্রী থাকবে বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্যের মত বর্দ্ধমানের রাজকন্যা।

[দ্রুত প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। জগতরাম।

জগত। বাবা!

কৃষ্ণরাম। বহুদিনের ছাই চাপা আগুন আবার জ্বলে উঠেছে। এবার বোধহয় সুভাসিংহের অত্যাচার ষোলকলায় পূর্ণ হবে। জগতরাম! তৈরী হও—সমস্ত সৈন্যকে তৈরী থাকতে বল। সুভাসিংহ আসবে—সঙ্গে থাকবে আফগান দস্যুপতি রহিম খাঁ। জেগে থাকো —অতন্দ্র প্রহরীর মত রাত্রিদিন পাহারা দাও। সাবধান! জীবন-দেবে—রক্ত দেবে, তবু রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বংশ মর্য্যাদা কলঙ্কিত হতে দিও না।

[প্রস্থান।

জগত। রাজবংশের মর্য্যাদা কলঙ্কিত হবার আগে সুভাসিংহের চেতোয়া ধ্বংস করব,—রহিম খাঁর নাম বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলে দেব,—বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবার আগে দামোদরের উত্তাল তরঙ্গে সে আগুন নিভিয়ে দেব। [প্রস্থানোদ্যত।]

ছদ্মবেশী হিম্মতসিংহকে তাড়া করিয়া সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। না না, তোকে আজ কিছুতেই রেহাই দেব না। বল শয়তান! কে তুই? কেন মিছে কথা বলে এতক্ষণ আমাদের ঘোরালি?

হিম্মত। আরে বাবা! মিছে কথা নয়—সত্যিই ডাকাত এসেছিলেন। বিশ্বাস না হয় এই রাজপুত্তুরকে জিজ্ঞাসা কর।

জগত। কি হয়েছে?

সৌবীর্য্য। এই ব্যাটা,—সেই কখন থেকে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে—রাজবাড়ীতে নাকি ডাকাত পড়বে। অথচ কে—কখন আসবে তার কোন হদিস নেই। এখন আবার বলতে সুরু করেছে —ডাকাত এসেছিল—কিন্তু ছদ্মবেশে।

জগত। হ্যাঁ—রাজ বংশের মান-মর্য্যাদা লুট করতে সত্যই ডাকাত এসেছিল সেনাপতি।

হিম্মত। ঐ দেখ আমার কথা খেটেছেন কি না?

জগত। কিন্তু যে এসেছিল সে তো সুভাসিংহের দূত।

হিম্মত। এই চোখ নিয়ে আপনারা রাজত্ব কর? লোক দেখলে চিনতে পার না?

জগত। তার মানে?

হিম্মত। তার মানে তুমি একটা কাণা। ছদ্মবেশে কে এসেছিল জান?

জগত। কে এসেছিল?

হিম্মত। এসেছিল সুভাসিংহ নিজে।

সৌবীর্য্য। সুভাসিংহ?

হিম্মত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জগত। তাই যাবার সময় সদম্ভে যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। ওঃ—কি ভুল করলাম! শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ধরতে পারলাম না?

হিম্মত। ধরতে পারবে কি করে? তোমাদের এই অগামার্কা সেনাপতিকে আমি সেই কখন থেকে—

সৌবীর্য্য। থামো!

হিম্মত। আরে যাও—যাও! তোমার মত বুদ্ধি নিয়ে চাকর-গিরি করা চলে—সেনাপতি হওয়া চলে না।

সৌবীর্য্য। ভিক্ষুক! [আক্রমনে উদ্যত]

জগত। দাঁড়ান। সত্য বল ভিক্ষুক তুমি কে?

হিম্মত। আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ...রামায়ণ পড়েছ? লক্ষ্মণকে জান? আমি সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুগত ভাই মহাবীর লক্ষ্মণ। ছায়ার মত দাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই।

জগত। অর্থাৎ তুমি সুভাসিংহের ভাই?

হিম্মত। এই তো চোখ খুলেছে। এইতো দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ। ব্যস্—আর ভাবনা নেই। এইবার কোমর বেঁধে লেগে যাও। শালা রহিম খাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুভাসিংহের ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ করে দিয়ে এই বাংলার মাটিতে একটু শান্তির গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।

[প্রস্থানোদ্যত।]

জগত। শোন বন্ধু, শোন! ছোট ভাই হয়ে বড় ভাইয়ের

মুখোসটা যেমন করে খুলে দিয়ে গেলে, তার প্রতিদানে কিছু পুরস্কার নিয়ে যাও।

হিম্মত। পুরস্কার নেব সেইদিন—যেদিন আফগান দস্যুসর্দার রহিমখাঁকে বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে—আর তার দোস্ত সুভাসিংহের কু-মতলবটা ফাঁসিয়ে দিয়ে তার উলঙ্গ রূপটা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবে। [পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

জগত। কিন্তু তুমি আহত,—সমস্ত গায়ে তোমার রক্তের ধারা। একটু বিশ্রাম করে যাও।

হিম্মত। তাই কখনো হয়? রাম চলে গেছে অনেকক্ষণ, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষণ কি পিছিয়ে থাকতে পারে? আর আহত কে? রক্ত কোথায়? এ যা দেখছ—সব আমার ছদ্মবেশ। দাদার আগে তোমাদের কাছে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিতে এসেছিলাম। সাবধান! হুঁসিয়ার থাকবে। নমস্কার। [সেনাপতিকে ব্যঙ্গ মুখ-ভঙ্গী করিয়া] আপনাকে নমস্কার মশায়।

[প্রস্থান।

সৌবীর্য্য। সুভাসিংহ যখন হাত ছাড়া হয়ে গেছে—তখন তার ভাইটাকে বন্দী করে রাখা উচিত ছিল কুমার।

জগত। লোকটা ঠিকই বলে গেছে। এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে আপনার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সেনাপতি হওয়া চলে না।

[প্রস্থান।

সৌবীর্য্য। রাজপুত্র হলেও তার সীমাহীন স্পর্দ্ধাকে সহ্য করা আমার ধাতে সইবে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পল্লী পথ।

বিন্দুবাসিনীকে চাবুক মারিতে মারিতে
উন্মত্ত রহিম খাঁর প্রবেশ।

বিন্দু। না না, মেরো না—ভগবানের নামে দিব্যি করে বল্‌ছি আমার কাছে কিছু নেই। মেরো না—মেরো না—

রহিম। [চাবুক মারিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—কাফের···ভগবান···দিব্যি··· হাঃ-হাঃ-হাঃ···[চাবুক মারিয়া] দে—এখনো বল্‌ছি সব বার কর্‌! নইলে তোকে—

বিন্দু। বিশ্বাস কর—ওগো। আমি মিছে কথা বল্‌ছি না—আমার কাছে সোনা-দানা কিচ্ছু নেই।

রহিম। কোন কথা শুনব না! আফগান দস্যু রহিম খাঁর কাছে কেউ কখনো রেহাই পাই নি। সে যাকে ধরেছে তার খুন পর্য্যন্ত চুষে নিয়েছে।

বিন্দু। কিন্তু আমরা যে গরীব—দিন আনি, দিন খাই। আমরা টাকা কড়ি গহনা-গাঁটি কোথায় পাব? এই দেখ—আমার গায়ে এক কুচিও সোনা নেই। পরনে ছেঁড়া কাপড়! স্বামী আমার যা রোজগার করে, তাতেই আমরা কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকি।

রহিম। থাম্‌ শয়তানি! মায়া কান্নায় আমায় ভোলাতে পারবি না। সহজে দিবি তো দে—নইলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

বিন্দু। যত দুঃখ দিতে চাও দাও,—যত চাবুক মারতে চাও মারো,—শুধু কয়েক ফোঁটা রক্ত পেতে পার,—কিন্তু এক টুকরো সোনা পাবে না।

রহিম। এখনো ভণ্ডামি? মনে রাখিস্—আমার নাম রহিম খাঁ। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এমন কোন মরদ নেই যে আমার নাম শুনলে কেঁপে না ওঠে। বাংলার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ পর্য্যন্ত আমার ভয়ে জুজুর মত গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে যায়।

বিন্দু। তোমার পায়ে পড়ি—তোমার ধর্ম্মের দোহাই,—আমায় ছেড়ে দাও। না হয় আমার ঘর তল্লাসী কর—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ—আমার কথা সত্য কি না?

রহিম। তল্লাসী করব পরে। আগে তোকে চাবুকের ঘায়ে—[চাবুক মারিল]

বিন্দু। আঃ—আঃ—

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ……

বিন্দু। ওগো বাংলার মানুষ! তোমরা কি ঘুমিয়ে আছো? শুনতে পাচ্ছ না নারীর আর্ত্তনাদ?

রহিম। আর্ত্তনাদ! বাংলার মানুষ! [প্রহার] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিন্দু। আঃ—জাগো! জাগো গরীবের ভগবান! দস্যুর হাতে আজ বাংলার নারী লাঞ্ছিতা,—চাবুকের ঘায়ে আজ নারীর রক্ত মাটিতে ঝরে পড়ছে, তুমি জাগো! চোখ মেলে চেয়ে দেখ,—চূর্ণ কর তার পাপদেহ,—ধ্বংস কর তার অহঙ্কার,—রক্ষা কর শয়তানের কবল থেকে বাংলার নারীর মান-মর্য্যাদা।

রহিম। কেউ নেই—কেউ পারবে না আমার হাত থেকে

তোকে রক্ষা করতে। বল্—এখনো বল্—নইলে তোকে শেষ করে দেব! [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

বিন্দু। ওগো! কে কোথায় আছো! রক্ষা কর—রক্ষা কর—

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ······

[নেপথ্যে দণ্ডধর—"কে ডাকে? কে আর্ত্তনাদ করে?"···]

ছুটিতে ছুটিতে দণ্ডধরের প্রবেশ।

দণ্ডধর। বিন্দু! বিন্দু! একি! কে তুই শয়তান? কেন আমার স্ত্রীকে চাবুক মারছিস?

রহিম। আমি রহিম খাঁ।

দণ্ডধর। রহিম খাঁ?

রহিম। হ্যাঁ—বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহাত্রাস আফগান-সর্দ্দার আমি।

দণ্ডধর। কেন এসেছ এখানে?

রহিম। লুট করতে।

দণ্ডধর। কি নেবে আমাদের কাছ থেকে?

রহিম। কিছু না পাই তোর বিবিকে নিয়ে যাব।

দণ্ডধর। শয়তান!

রহিম। হুঁসিয়ার কাফের! [প্রহার]

বিন্দু। ডাকাত!

রহিম। চলে আয় শয়তানি? [বিন্দুর এক হাত ধরিয়া আকর্ষণ]

দণ্ডধর। [পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল] না, না—যেতে দেব না। চাবুকের ঘায়ে দেহের সমস্ত রক্ত ঝরিয়ে দাও—ঘরদোর

জ্বালিয়ে দিয়ে শ্মশান তৈরী কর। তবু দস্যু! পারবে না তুমি আমার চোখের ওপর থেকে আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যেতে।

রহিম। বটে? কাফেরের এত শক্তি? কই দেখি—

[চাবুক প্রহার ও পদাঘাত]

দণ্ডধর। আঃ—[পতন]

বিন্দু। স্বামি!

দণ্ডধর। বিন্দু!

বিন্দু। স্বামি!

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ……

[বিন্দুকে টানিতে টানিতে প্রস্থান।

[দূর হইতে বিন্দুর আর্ত্তকণ্ঠ—"স্বামি"!…রহিম খাঁর অট্টহাসি—"হাঃ-হাঃ-হাঃ"…দণ্ডধর এতক্ষণ মাটিতে পড়িয়াছিল। এইবার করুণ স্বরে গাহিতে গাহিতে উঠিতে লাগিল। দেখা গেল তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে]

দণ্ডধর।—

গীত।

সাথী হারা করে রেখে গেল মোরে জীবনের কুঁড়ে ঘরে।
রহিল না আর যে ছিল আমার, আঁখিজল শুধু ঝরে।
আছো কি হেথায় তুমি ভগবান!
সহিলে নীরবে এই অপমান?
উঠিল না ঝড়, কাঁপিল না মাটি কম্পনে থর থরে?

[প্রস্থান

ব্যস্তভাবে চূড়াধরের প্রবেশ।

চূড়াধর। কি রকম হলো? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না তো? চারিদিকে হৈ-হুল্লোড়! গাঁয়ের লোক সব ছুটোছুটি করছে! বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে কেউ কেউ পালিয়ে যাচ্ছে! কোথাও কিছু ঘটল নাকি?

ছুটিতে ছুটিতে গুয়ের প্রবেশ।

গুয়ে। পালাও—পালাও—শীগ্‌গীর পালিয়ে যাও।

চূড়াধর। কেন—কেন, হয়েছে কি?

গুয়ে। সেই শালা নাক-কাটা রহিম খাঁ গাঁয়ে ঢুকে লুটপাট সুরু করেছে। যাকে সামনে পাচ্ছে চাবকে লাল করে দিচ্ছে।

চূড়াধর। বলিস কি?

গুয়ে। একটু আগে দণ্ডকাকার বউকে ধরে নিয়ে গেছে।

চূড়াধর। সেকি!

গুয়ে। বাধা দিতে গিয়েছিল—মেরেছে এক হাতিয়ায়ের কোপ। কপাল বেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে।

চূড়াধর। কি সর্ব্বনাশ! দিন দুপুরে ডাকাত? তাহলে তো এ গাঁয়ে আর টেঁকা যাবে না দেখ্‌ছি।

গুয়ে। টেঁকার কথা কি বলছ? গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

চূড়াধর। যাবেই তো। ঘরের বউকে নিয়ে যখন টানাটানি সুরু করেছে—তখন ধনসম্পত্তি নেবে তো তুড়ীর আগে।

গুয়ে। তুমিও সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও। মামাকে নিয়ে সরে পড়ি চল। নইলে শালা আবার কোন্ ফাঁকে এসে মামীকেও ধরে নিয়ে যাবে।

চূড়াধর। ওরে বাবা সেকি কথা?

গুয়ে। তার ওপর ধর মামী তো আমার দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। ধরে নিয়ে শালা হয়তো বিবি করে নেবে।

চূড়াধর। গুয়ে! আর বলিস নে। বুকখানা আমার ফেটে যাবে। তোর মামী যেদিন মল পায়ে দিয়ে ঘরে এল,—ছোট্ট এতটুকু বউ ঘোমটা দিয়ে আমার আশে পাশে ঘুর-ঘুর করতে লাগল—সেদিন থেকে বুঝলি গুয়ে! আমার গায়ে যেন লতার মত জড়িয়ে জড়িয়ে আছে। [সহসা কান্নার স্বরে] সেই মামীকে তোর কোন্ পরাণে—

গুয়ে। এই দেখ! কান্নাকাটি এখন শিকেয় তোল। মামীকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার—

চূড়াধর। কোথায় পাব তাকে? কদিন আগে যে বাপের বাড়ীতে রেখে এলাম।

গুয়ে। তবে তো ভালই হয়েছে। শীগ্গীর ঘরে যাও। হাতের সামনে যা পাও গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়।

চূড়াধর। কিন্তু তোর মামীকে ফেলে—

গুয়ে। কি মুস্কিল। মামী তো বাপের বাড়ী।

চূড়াধর। কিন্তু কোথায় যাব? শালা রহিম খাঁ যদি যেতে যেতে ধরে ফেলে।

গুয়ে। তখন যা হয় করা যাবে।

চূড়াধর। কি জানি গুয়ে! আমার বড় ভয় করছে! তুই একটু সঙ্গে চল। দরজাটা খুলে অন্ততঃ হুঁকো-কল্কে আর খানিকটা তামাক সঙ্গে নিই।

গুয়ে। কিন্তু বেশী দেরী করলে বিপদে পড়তে হবে।

চূড়াধর। না না—যাব আর আসব। কাসুন্দী আর আচারের হাঁড়ী দুটো না হয় পাঁচীদের বাড়ী রেখে যাবখোন। কি বলিস?

গুয়ে। কেন? ও দুটোও সঙ্গে নাও। রাস্তায় যেতে যেতে—

চূড়াধর। দূর গাধা, কাসুন্দি আর আচার যে অযাত্রা। আয় আয় বাবা! একটু আশে পাশে নজর রেখে আয়। শালা ডাকাত যেন গপ্‌ করে এসে ধরে না ফেলে।

গুয়ে। কোন ভয় নেই। তুমি চল মামা, দুগ্যা বলে বেরিয়ে পড়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

বৰ্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি "জয় বৰ্দ্ধমান অধিপতি
রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের জয়।"]

সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীৰ্য্য। হাঁ হাঁ, জয়ধ্বনি দাও! বাতাসে আজ আগুনের জ্বালা, মাটিতে আজ শত্রুর পদধ্বনি—ঘরে ঘরে শাঁখ বাজাও—দেশ প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে সবাইকে দীক্ষিত কর। বাঙালী আজ বাঙালীর বুকে আঘাত করতে আস্‌ছে—তার রক্তে দামোদরের জল লাল করে দাও।

কৃষ্ণরাম রায়ের প্রবেশ।

কৃষ্ণরাম। [দূর হইতে] লাল! লাল! পলাশের মত রক্ত রাঙা লাল খুনে বাংলার মাটি লাল হয়ে যাবে,—তার রক্তিম আভায় বাংলার আকাশ হয়ে উঠ্‌বে লাল,—বাতাসে বইবে রক্তের নেশা,—তারপর সে রক্তের গোপন ফল্গুধারা যুগ-যুগান্ত ধরে বয়ে যাবে বাঙালীর জীবন-স্রোতে। ওগো বাংলা! ওগো আমার মাটির মা! [চক্ষে জল আসিল]

সৌবীৰ্য্য। মহারাজ!

কৃষ্ণরাম। কে? ও, সেনাপতি! কি সংবাদ?

সৌবীৰ্য্য। সুভাসিংহ আফগান দস্যু-সর্দ্দার রহিম খাঁকে চেতোয়ায় আনতে লোক পাঠিয়েছে। মনে হয়—

কৃষ্ণরাম। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আমার বর্দ্ধমান আক্রমণ করবে?

সৌবীর্য্য। সম্ভবতঃ তাই।

কৃষ্ণরাম। বাংলার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁকে এ বিদ্রোহের কথা জানিয়েছ?

সৌবীর্য্য। হাঁ মহারাজ! পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণরাম। তাঁকে বলেছ যে এ বিদ্রোহের মূল নায়ক সুভাসিংহ হলেও তার পিছনে রয়েছে পাঠান-দস্যু রহিম খাঁর দুর্দ্ধর্ষ-বাহিনী?

সৌবীর্য্য। হাঁ বলেছি। কিন্তু আমার মনে হয়—বাংলার শাসনকর্ত্তা এ বিদ্রোহকে মোটেই আমল দিচ্ছে না।

কৃষ্ণরাম। কেন?

সৌবীর্য্য। তাঁর মতে এ নাকি একটা ঘরোয়া ঝগড়া। কারণ চেতোয়ার জমিদার সুভাসিংহের সঙ্গে বর্দ্ধমানের এই শত্রুতা বহুকালের। কাজেই—

কৃষ্ণরাম। কাজেই এটা বিদ্রোহ নয়? যাক্—তুমি জগতকে ডেকে দাও, আমি তাকে আজই জাহাঙ্গীর নগরে নবাবের কাছে পাঠাব।

সৌবীর্য্য। আমি এখনই কুমারকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণরাম। আর শোন! এই সঙ্গে দিল্লীতে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাছেও বাংলার এই বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে একখানি পত্র দাও। পত্রে জানাবে—তিনি যেন এই মুহূর্ত্তে বাংলার শাসনকর্ত্তাকে আদেশ দেন এই বিদ্রোহ দমন করতে। যাও!

সৌবীর্য্য। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা! এ ঘুম কি সহজে ভাঙবে? মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে বাংলা শাসন করছে—অথচ পাঠান দস্যু দলে দলে বাংলায় এসে ডাকাতের মত লুট করছে—বাংলার ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিচ্ছে। সুভাসিংহ তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে লুটের জিনিষে ভাগ বসাচ্ছে, বর্দ্ধমান রাজাকে প্রকাশ্যে চোখ রাঙিয়ে তার মেয়েকে পর্য্যন্ত—

বিষণ্ণমুখে সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। বাবা!

কৃষ্ণরাম। আয় মা! এমন অসময়ে কেন এলি রে?

সত্যবতী। চেতোয়ার জমিদার আমাদের এখানে এসেছিল কেন বাবা?

কৃষ্ণরাম। [ইতস্ততঃ করিয়া] না, মানে—এসেছিল একটা আবার গণ্ডগোল বাধাতে।

সত্যবতী। কিসের গণ্ডগোল?

কৃষ্ণরাম। পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবার বোধহয় সুভাসিংহ আমার রাজ্য আক্রমণ করতে পারে।

সত্যবতী। কেন?

কৃষ্ণবাম। আমরা নাকি কবে কি অত্যাচার করেছিলাম,—সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে এতকাল পরে—

সত্যবতী। বাবা। বাবা! আমার কাছে লুকিও না। সত্য বল কেন সে এসেছিল?

কৃষ্ণরাম। আহা-হা, লুকোবো কেন? বহুকালের চাপা আগুন

মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে, আর তার উত্তাপের জ্বালা খানিকটা উগ্‌রে দিয়ে যায় বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে।

সত্যবতী। শুধু প্রতিশোধ নেওয়াই কি তার ইচ্ছা,—না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

কৃষ্ণরাম। আবার কি উদ্দেশ্য থাক্‌বে? বহুকালের শত্রুতা— তার ওপর ধনরত্নের লোভ, ডাকাতের সঙ্গে মিশে যদি কিছু—

সত্যবতী। কিন্তু আমি শুনলাম—

কৃষ্ণরাম। কি শুনলি আবার?

সত্যবতী। সে নাকি আমাকে বিবাহ করতে চায়?

কৃষ্ণরাম। এই দেখ, এ-সব আবার শুনলি কোথা থেকে?

সত্যবতী। তুমি নাকি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ—তাই সে দস্যুসর্দ্দারকে নিয়ে আস্‌ছে—

কৃষ্ণরাম। নিয়ে আস্‌ছে?

সত্যবতী। আমাকে কেড়ে নিতে?

কৃষ্ণরাম। সত্যবতী! না না—এ-সব কথা তোকে কে বললে? বর্ত্তমানে বাংলার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী রাজ্য এই বর্দ্ধমান। সুভাসিংহের এত সাহস হবে রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের অন্তরে আঘাত দিয়ে তার কন্যাকে—না না, অসম্ভব। তুই কিছু ভাবিস নে মা! আর যদি সত্যিই কোনদিন এমন বিপদ আসে তাহলে তুই তো বাংলার মেয়ে, পারবি না তোর নারীধর্ম্ম তুই নিজে রক্ষা করতে? [সত্যবতী নিরুত্তর। শুধু তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।] বল্‌ মা! মুখ ফুটে একবার বল্‌! একি! তুই কাঁদছিস সত্য!

সত্যবতী। বাবা! এই অভিশপ্ত জাতির মধ্যে কি এমন কেউ

জন্মাবে না—যার জলন্ত দেশপ্রেমের আগুনে এই সব কামান্ধ লম্পট পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

কৃষ্ণরাম। জন্মাবে—জন্মাবে। সেদিন আস্‌ছে মা!

সত্যবতী। কবে সে শুভদিনের শাঁখ বেজে উঠবে বাবা? ঘরে ঘরে কান্না,—ঘরে ঘরে হাহাকার,—অত্যাচার উৎপীড়নে বাংলার নারী আজ চোখের জল ফেল্‌ছে, বুকের নিঃশ্বাসে অভিশাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কবে তার জন্ম হবে? কত দিন পরে তার বিজয় নিশান উড়বে? কত যুগ পরে তার হাতের চাবুক চক্র হয়ে দেখা দেবে?

জগত রামের প্রবেশ।

জগত। আমায় ডেকেছেন বাবা।

কৃষ্ণরাম। হাঁ, এস জগত।

জগত। একি! সত্য তুই এখানে? চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল—জল গড়িয়ে পড়েছে—ব্যাপার কি?

কৃষ্ণরাম। ও সব জানতে পেরেছে জগত!

জগত। তাতে কি হয়েছে? তাতে কাঁদবার কি আছে? আসুক না সুভাসিংহ—আসুক না রহিম খাঁ তার দস্যুবাহিনী নিয়ে, তাই বলে আমরাও কি পিছিয়ে থাকব? হুঁ—সামান্য একটা চেতোয়ার জমিদার—গোটাকতক ডাকাত আর লাঠিয়াল নিয়ে যুদ্ধ করবে আমাদের সঙ্গে?

সত্যবতী। তোমরা যাকে আজ সামান্য বলে মনে করছ, যুদ্ধ আরম্ভ হলে দেখো তাদের ভয়ে বাংলার সামন্ত রাজারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

জগত। এমন দুর্ভাগ্য যদি কোনদিন আসে, তাহলে সেদিন শুধু বর্দ্ধমান নয়—ভারতের বুক থেকে বাংলার অস্তিত্ব মুছে যাবে।

সত্যবতী। মুছে যাবে না দাদা! বাংলা বেঁচে থাকবে—আর বিদ্রোহীরাই হবে তার শাসনকর্ত্তা।

জগত। আরে যাঃ-যাঃ। সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। মগের মুল্লুক আর কি? মোগল বাদশাহের ফারমান বলে তবে এ রাজ্য গড়ে উঠেছে। আমরা বালির বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে নেই বোন! আমাদের পেছনে রয়েছে বাংলা ও দিল্লীর মোগল রাজশক্তি।

সত্যবতী। এ বিদ্রোহ দমন করতে যদি রাজশক্তি এগিয়ে না আসে?

জগত। তাহ'লে নিজেরাই লড়ব। আর লড়াইয়ের শেষে দিল্লীর সিংহাসনের সামনে সেই ফারমানখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে আসব—চাই না তোমাদের দয়ার দান। আজ থেকে বাংলা আর মোগলের দাসত্ব করবে না—ক্ষমতা থাকে স্বাধীন বাংলার জাতীয় নিশান তারা নিজেরাই তুলে ধরবে।

সত্যবতী। তা যদি পার—তাহলে বুঝব তোমরা মানুষ।—ভারতের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে তোমাদের বীরত্ব, বর্দ্ধমানের পথের ধুলো হবে তীর্থের মত পবিত্র, শত যুগ পরেও যারা জন্মাবে এই বাংলার মাটিতে—তারাও গর্ব্বভরে উঁচু মাথায় জানাবে তোমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। তবে যাও পুত্র! এই মুহূর্ত্তে ছুটে যাও বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর দরবারে। তাঁকে জানিয়ে এস এই বিদ্রোহের

কথা। আর জোর গলায় বলে এস—প্রজাদের সুখ-দুঃখের মালিক হয়ে যদি তুমি বিদ্রোহীদের এই অত্যাচার দমন না কর তাহলে বাংলার মসনদ ছেড়ে দিয়ে তোমাকে একদিন মক্কায় গিয়ে ঘর বাঁধতে হবে।

[প্রস্থান।

জগৎ। সুভাসিংহ! মরণের জন্য তৈরী হও। রহিম খাঁর কবরের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটিতে তোমার চিতাও সাজাব, তোমার চেতোয়া—তোমার বর্দ্ধোয়া ধ্বংস করে বাংলার বুক থেকে তোমাদের কলঙ্কচিহ্ন চিরদিনের মত মুছে দেব।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

আগে আলুথালু বেশে ভীতাত্রস্তা বিন্দুবাসিনী, পশ্চাতে উদ্যত চাবুক হস্তে রহিম খাঁর প্রবেশ।

বিন্দু। মেরো না—ওগো আর মেরো না—যেখানেই তুমি যেতে বলবে—আমি যাব।

রহিম। আর পালাবার চেষ্টা করবি?

বিন্দু। না।

রহিম। মাঝ পথে এসে মনে করেছিস তোকে ছেড়ে দেব?

ওরে কস্‌বী! আমার নাম রহিম খাঁ—যার নাম শুনলে মানুষ তো দূরের কথা—বনের বাঘও পালিয়ে যায়।

বিন্দু। না না—চল কোথায় যেতে হবে।

রহিম। তোকে আমি চেতোয়ায় নিয়ে যাব। আমার দোস্ত সুভাসিংহ খবর পাঠিয়েছে। সেখানে গিয়ে তোকে আমি—

বিন্দু। চেতোয়া? সে কত দূরে? আর যে আমি চল্‌তে পারছি নে। চাবুকের ঘায়ে এই দেখ আমার গায়ে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে।

রহিম। ও দাগ আর থাকবে না। আমার দোস্ত সুভাসিংহের পেয়ারী হলে—

বিন্দু। দস্যু!

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বাংলা মুলুকটাকে আমি দলে চষে সমভূমি করে দেব। এরা মোগলের চাকর হয়ে থাকতে চায়—তবু পাঠানের দোস্তি চায় না। না না, চালাও লুট—চালাও অত্যাচার—হত্যায় লুণ্ঠনে বাংলার বুকে হাহাকার তোল।

খালি মদের বোতল হাতে মাতাল হিম্মত সিংহের প্রবেশ।

[হিম্মতকে আসিতে দেখিয়া বিন্দুবাসিনী একপাশে সরিয়া গেল]

হিম্মত। দাঁড়াও—দাঁড়াও বাবা যমের কিঙ্কর! সুজলা সুফলা বাংলার বুকে স্বর্গসুখটা আগে মিটিয়ে নিই, তারপর তুমি যমদণ্ড নিয়ে—

রহিম। কে তুই শয়তান?

হিম্মত। শয়তান আমি নই বাবা—শয়তান আমার দাদা। আমি তোমার মা-বাবার আশীর্ব্বাদে স্বর্গের দেবতা।

রহিম। কি চাস তুই ?

হিম্মত। একটু মদ দিতে পার ? ছুঁড়ীটাকে এত করে বললাম —ওরে বাবা! বোতল তুই অন্ততঃ সঙ্গে দে। এতখানি রাস্তা— মদ না হলে চলব কি করে ? এই দেখ না—একদিন যেতে না যেতেই বোতলটা একেবারে খালি।

রহিম। কোথায় যাচ্ছিস ?

হিম্মত। ঐ যে কি বলে—বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বনামধন্য ডাকাত—মানে নাককাটা দস্যুসর্দ্দার রহিম খাঁ—তার কাছেই যাচ্ছি বাবা।

রহিম। কেন ?

হিম্মত। দাদার আদেশ! তাকে আজই চেতোয়ায় হাজির করতে হবে। তাই রামভক্ত অনুজ লক্ষণ চলেছে এই বনের পথে তারই সন্ধানে।

রহিম। তুমি কি তাহলে সুভাসিংহের ভাই ?

হিম্মত। একেবারে কলির সাক্ষাৎ রামানুজ।

রহিম। আর যেতে হবে না। আমিই সেই পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ—চেতোয়ায় যাচ্ছি তোমার দাদার চিঠি পেয়ে।

হিম্মত। তাই নাকি ? তুমিই সেই যমদূত রহিম খাঁ ? বাঃ-বাঃ-বাঃ—কি সৌভাগ্য আমার! মনে মনে যেমন স্মরণ করা—অমনি এই বনের মাঝখানেই মহাপুরুষ সশরীরে সামনে এসে হাজির। যাক্—চল বাবা চাবুক হস্তেন যমদূত! দাদার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে আমি একটু পরকালের কাজ করি গে।

রহিম। হাঁ, চল। [বিন্দুকে] এই চলে আয় ? [গমনোদ্যত]

হিম্মত। ও বাবা! এ আবার কে ?

রহিম। হিন্দু আওরাৎ। পথে আসতে আসতে জুটিয়ে নিয়েছি।

হিম্মত। তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। কিন্তু এ আওরাতটি তোমার শেষ পর্য্যন্ত চেতোয়ায় পৌছবে তো?

রহিম। কেন?

হিম্মত। দূর থেকে কান্না শুনতে পেয়েছিলাম'—সামনে এসে দেখ্‌ছি চাবুকের ডগায় তো যমের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছ! তাই বলছিলাম একে চেতোয়ায় না নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে যাও।

রহিম। আরে না না, এ এখনো খুব মজবুত আছে।

হিম্মত। তা থাকবে খাঁ সাহেব। বাংলার মেয়ে কি না— তাই মরে গিয়েও আঠারো বাজী খেলে। হঠাৎ কিছু বলে না। কিন্তু যদি একবার ফোঁস করে, বুঝলে খাঁ সাহেব! তাহলে কিন্তু রক্ষে নেই।

রহিম। আরে রেখে দাও। ও রকম ফোঁস-ফোসানি আমি ঢের দেখেছি।

হিম্মত। ফোঁস-ফোসানি দেখেছ—কিন্তু ছোবল তো খাওনি মিঞা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আরে খাঁ সাহেব! এতবড় ডাকাত তুমি, সারা বাংলা বিহার উড়িষ্যা তোমার নামে থরহরি কম্পমান, আর তুমি কি না এই মাছি মেরে হাত কালো করতে যাচ্ছ?

রহিম। অরুচি ধরে গেছে। তাই মাঝে মাঝে বাঘ ভাল্লুক ছেড়ে মাছিও মারতে হয়।

হিম্মত। বিশেষতঃ সে মাছি যদি খাপসুরৎ হিন্দুর মেয়ে হয়— কি বল মিঞা?

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তবে চল খাঁ সাহেব! একে আমাদের প্রাসাদেই নিয়ে চল। সুভাসিংহের বন্ধু তুমি, বন্ধুর উপঢৌকনটা বেশ—

রহিম। লাগসই হবে—না?

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হিম্মত। চল মা লক্ষ্মী! ভেবে আর কি করবে? ঘাবড়াও মাৎ। রাখে কেষ্ট মারে কে—আর মারে কেষ্ট রাখে কে? কি বল খাঁ সাহেব।

রহিম। তাতো বটেই—তাতো বটেই।

হিম্মত। চল চল আর দেরী করে লাভ নেই। তুমি বাবা যমদূত আগে চল, মা লক্ষ্মী থাক মাঝখানে,—আর আমি যাই সকলের শেষে এই খালি মদের বোতল হাতে নিয়ে—[সুরে]

"মাতাল যদি করলি শ্যামা—
নাম-মদিরায় ডুবতে দে—"

[আগে রহিম খাঁ,—মাঝখানে বিন্দুবাসিনী ও শেষে গাহিতে গাহিতে হিম্মতের প্রস্থান।

বোঁচকা মাথায় চূড়াধর ও পশ্চাতে গীতকণ্ঠে গুয়ের প্রবেশ।

গুয়ে।— গীত।

(তোর) জীবন গাঙে পাল তুলে দে ওরে পাগল নেয়ে
ঘুমাস নে আর, বৈঠা চালা না নিয়ে চল্ বেয়ে।

পারে যাবার ডাক এসেছে,
জোয়ার জলে ঢেউ লেগেছে,
তীরে যাবার সময় গেল চল না রে মন ধেয়ে
ওরে পাগল নেয়ে।

চূড়াধর। থাম্ ব্যাটা, থাম্! তোর মড়া কান্না আর ভাল লাগে না।

গুয়ে। কি বললে? আমার গান মড়াকান্না? দেখ মামা! ঘুরে ঘুরে মেজাজটা খিঁচিয়ে আছে। খুব হুঁসিয়ার হয়ে বাতচিৎ করবে।

চূড়াধর। তা রাগছিস কেন? কোথায় যাবি কোন পথ দিয়ে যাবি—এই সব চিন্তা না করে এই বেঘোর জঙ্গলে কি গান ভাল লাগে?

গুয়ে। যাব আবার কোথায়? চলতে চলতে পা দুটো যেদিকে যায়—সেই দিকেই যাব।

চূড়াধর। আর আমি এই বোঁচকা মাথায় তোর পেছনে ঘুরি। তুই ব্যাটা গাঁজার কলকেয় দম দিয়ে—

গুয়ে। [চিৎকার করিয়া] মামা! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। এই পথের মাঝখানে গাঁজার নিন্দে করলে—আমিও কিন্তু র-হি-ম-খাঁকে ডাকব।

চূড়াধর। এই দেখ—এই দেখ! দোহাই বাবা! অমন করো না। যতদিন পার তুমি গাঁজা খাও—কলকের মাথায় মহাদেবকে—টেনে আনো—আমি আর কোন কথা বলব না। শুধু এই বোঁচকাটার একটা হিল্লে করতো মাণিক। এ যে আর বইতে পাচ্ছি নে।

গুয়ে। জঙ্গলটা পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকি চল—তারপর একটা লোকজন দেখে নেওয়া যাবেখোন।

চূড়াধর। লোকজন তো দেখে নিবি—কিন্তু পয়সা? পয়সাটা আসবে কোত্থেকে?

গুয়ে। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। গাঁজার কল্‌কে যতক্ষণ আমার হাতে আছে—বুঝলে মামা! ততক্ষণ ও পয়সাই বল—আর লোকজন বল—শালা গন্ধে পাগল হয়ে ছুটে আস্‌বে।

চূড়াধর। বেশ বাবা, বেশ। আমি দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—তুমি যাও তাতে দুঃখ নেই,—তোমার গাঁজার কল্‌কে যেন জন্ম জন্ম বেঁচে থাকে। এইবার চল বাবা। কোন্‌দিকে যেতে চাও একটু তাড়াতাড়ি চল।

গুয়ে। দেখ মামা! শালা রহিম খাঁ যখন এখানেও উৎপাত লাগিয়েছে, তখন আমরা বর্দ্ধমানের দিকে ধাওয়া করি চল।

চূড়াধর। বর্দ্ধমান?

গুয়ে। হ্যাঁ। নবাব তো নাকে কাঠি দিয়েও হাঁচছে না, তার চেয়ে বর্দ্ধমানে চল। সেখানে রাজা কেষ্টরাম রয়েছে! নালিশ করলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে ফল।

চূড়াধর। তবে চল্‌। তুই যখন বলছিস—তখন বর্দ্ধমানের দিকেই রওনা হওয়া যাক।

গুয়ে। বেশ, চল! কিন্তু হুঁসিয়ার! আমার কলকের নিন্দে যদি করেছ—

চূড়াধর। না বাবা। নিন্দে তো দূরের কথা—এবার তোমার কলকের পায়ে ফুল চন্দন দেব।

গুয়ে। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।

[উভয়ে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া হঠাৎ গুয়ে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।]

গুয়ে। ও মামা!--

চূড়াধর। কি হলো রে?

গুয়ে। ওই দেখ—দুটো লোক একটা বউকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।

চূড়াধর। তাই নাকি?

গুয়ে। হ্যাঁ। আমার মনে হয় ওই সেই শালা রহিম খাঁ—দণ্ডকাকার বউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

চূড়াধর। তাহলে আর এখানে দাঁড়াসনে গুয়ে। অন্যদিকে সরে পড়ি চল্।

গুয়ে। হ্যাঁ শীগ্‌গির চল—বর্দ্ধমানের দিকে পালাই।

চূড়াধর। জয় মা রক্ষেকালি! ডাকাতের হাত থেকে রক্ষে কর মা!

গুয়ে। জয় বাবা ব্যোম ভোলানাথ! আমার গাঁজার কলকে চটিয়ে দিও না বাবা—তাহলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

জাহাঙ্গীর নগর—নবাব প্রাসাদ।

বাঈজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

বাঈজীগণ।—

গীত।

দিল্-মহলার গুল-বাগিচায় আমরা ফুটি হাসনা-হেনা।
কে নিবি আয় মোদের পরশ বাইরে থেকে যায় না চেনা।
আতর গোলাপ রঙ্ বাহারে
মুচকি হাসির ঝিলিক মারে,
বুকের মধু উপ্‌ছে পড়ে, কে নিবি আয়, লুটে নে না।

চাবুকহস্তে উত্তেজিত জবর খাঁর প্রবেশ।

জবর। [দূর হইতে] আমি কোন কথা শুনতে চাই না। নবাব প্রাসাদে যারা গোলাপী আতরের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়,—ধর্ম্মের কেতাব নিয়ে যারা দিনরাত বেহেস্তের স্বপ্ন দেখে, তাদের আমি চাব্‌কে—[সহসা বাঈজীদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

১মা বাঈজী। নবাবজাদার যত রাগ কি আমাদের উপর?

জবর। চুপ্! একটা কথা নয়। আজ থেকে এ প্রাসাদে নাচ-গান চলবে না। ধর্ম্মের কেতাবগুলো কেড়ে নিয়ে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। আরামের ঘুম, সরাবের নেশা, বেহেস্তের কল্পনা—সব ঘুচিয়ে দিয়ে আমি আজ আব্বাকে বুঝিয়ে দেব—

১মা বাঈজী। কি বুঝিয়ে দেবেন?

জবর। শুধু বুঝিয়ে দেব না,—চোখে আঙুল দিয়ে নবাবকে দেখিয়ে দেব সুভাসিংহের বিদ্রোহের আগুন—পাঠানদস্যু রহিম খাঁর নির্ম্মম অত্যাচার—দিকে দিকে আর্ত্তমানুষের মর্ম্মভাঙা চীৎকার।

১মা বাঈজী। নবাবজাদা একাই তাহলে বাংলার কথা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছেন?

জবর। নবাব যখন চোখ থাকতেও অন্ধ, জেগে থেকেও যখন তিনি ঘুমিয়ে আছেন, তখন তাঁর ছেলে হয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে বৈকি!

১মা বাঈজী। আপনি কি বলতে চান—আমাদের নবাব নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন?

জবর। জেগে থাকার লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি না! দিন-রাত কেতাবের পাতা উল্‌টে যদি দুনিয়ার মানুষকে আপনার করা যেতো, তাহলে কামান বন্দুক গোলা-গুলির দরকার হতো না।

১মা বাঈজী। আপনি তো ধর্ম্মটর্ম্ম কিছুই মানেন না! কিন্তু আমাদের নবাব বলেন—

জবর। কি বলেন?

১মা বাঈজী। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কোন দেশ বেঁচে থাকতে পারে না।

জবর। [চাবুক উদ্যত করিয়া] বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে।

[বাঈজীগণের প্রস্থান।

জবর। ধর্ম্ম! কেতাব! রসাতলে যাক। এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আব্বা যদি আজ খোদাতালা হয়ে না বসতেন, বাংলার শাসনকর্ত্তা হয়ে যদি তিনি নিশ্চিন্ত আরামে দিন না কাটাতেন,

তা'হলে আজ ছুদিন ধরে বর্দ্ধমানের রাজপুত্রকে নবাবের সাক্ষাতের জন্য নবাব-প্রাসাদে অপেক্ষা করতে হতো না। তাহলে এতদিন সুভাসিংহের বিদ্রোহের কথা নবাবকে চীৎকার করে শোনাতে হতো না—এতদিন পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর ছিন্নমুণ্ড জাহাঙ্গীর নগরের রাজপথে গড়াগড়ি যেতো।

জগতরামের প্রবেশ।

জগত। তাহলে এতদিন বাংলার মান মর্য্যাদা এমনি করে পথের ধুলোয় লুটিয়ে যেতো না—অত্যাচার উৎপীড়নে বাংলার বুকে হাহাকার উঠতো না,—ইংরাজ-ফরাসী-ওলন্দাজ এই সব বিদেশীরা সাম্রাজ্যবাদী শিকড় নিয়ে ধীরে ধীরে বাংলার মাটিতে ঢোকবার সাহস করতো না।

উন্মাদের মত দণ্ডধরের প্রবেশ।

দণ্ডধর। তাহলে বাংলার নারীর ছুচোখ বেয়ে ব্যথার অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তো না, সর্ব্বহারার দুঃখ বেদনায় বাংলার আকাশ বাতাস ভরে উঠ্‌তো না, ঘরের লক্ষ্মীকে হারিয়ে আজ আমার মত কাউকে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হতো না।

জবর। কে—কে তুমি ভাই?

দণ্ডধর। আমি এক সর্ব্বহারা দীন দুঃখী বাঙালী—তোমাদের প্রজা।

জবর। কি চাও?

দণ্ডধর। বিচার চাই—প্রতিশোধ চাই। পাঠানদস্যু রহিম খাঁ আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে।

জবর
ও
জগত। } সে কি!

দণ্ডধর। এই দেখ এখনো আমার গায়ে চাবুকের দাগ—রক্তের ধারা! বিচার কর—ওগো, বিচার কর।

জবর। ওঃ, একি অত্যাচার! আব্বা! নবাবের সুখশয্যা ছেড়ে কেতাব ফেলে দিয়ে একবার বাইরে আসুন, চোখ মেলে দেখুন অত্যাচারীর তাণ্ডব লীলা, কান পেতে শুনুন অত্যাচারিতা লাঞ্ছিত নারীর করুণ আর্ত্তনাদ। মনে প্রাণে অনুভব করুন দেশ আজ কি চায়—কোথায় তার ব্যথা—কেন সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নেমে যাচ্ছে।

জগত। নবাব আর বাইরে আসবেন না নবাবজাদা। আপনি যদি পারেন ভেতরে গিয়ে তাঁকে বলে আসুন,—লুণ্ঠন-প্রয়াসী রহিম খাঁ আসছে বর্দ্ধমানের ধনরত্ন লুঠ করতে, শয়তান সুভাসিংহ আসছে বর্দ্ধমান রাজকন্যার নারীত্ব কেড়ে নিতে।

জবর। আব্বার কাছে গিয়ে আর কিছু হবে না কুমার। বাংলার শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মের কেতাব বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন; আমাদের ডাকে সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

জগত। আপনার কথায় তাহলে কি আমরা এই বুঝব যে, বিদ্রোহী নায়ক রহিম খাঁ আর সুভাসিংহের অত্যাচার থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করা তাঁর সাধ্যাতীত?

জবর। সাধ্যাতীত না হলেও তিনি তা করবেন না।

জগত। কেন?

জবর। তাঁর মতে একই মাটিতে জন্ম নিয়ে একই মায়ের সন্তান হয়ে কেন সুভাসিংহ মানুষের উপর অত্যাচার করবে—এই কথাটা—

জগত। এই কথাটা?

জবর। এই কথাটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। তিনি বলেন, হিন্দু হয়ে সে কি ধর্ম্মকে ভয় করে না? খোদার সৃষ্ট জীব মানুষের রক্তপাত করতে তার প্রাণটা কি কেঁদে ওঠে না?

দণ্ডধর। কেঁদে যদি উঠ্‌তো, তাহলে আজ তাদের অত্যাচারে বাংলার প্রজারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে না—অত্যাচারে লুণ্ঠনে সমস্ত দেশ হাহাকারে ভরে উঠ্‌তো না।

জগত। তাহলে এই বিদ্রোহ দমন করতে নবাব আমাদের সাহায্য করবেন না?

জবর। করবেন—যদি বিনা রক্তপাতে হয়।

দণ্ডধর। আমার স্ত্রীকে আর আমি ফিরিয়ে পাব না নবাব-জাদা?

জবর। পাবে—পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। চল ভাই! আমরা সবাই মিলে নবাবের অন্দর মহলে ঢুকে পড়ি। ঘুমন্ত নবাবকে নাড়া দিয়ে বলি—ওগো ধর্ম্মভীরু বাংলার শাসনকর্ত্তা! প্রকাশ্য দরবারে সকলের সামনে মুক্তকণ্ঠে বলুন—বিদ্রোহের আগুনে আপনি বাংলার নরনারীকে পুড়িয়ে মারতে চান, না দেশদ্রোহীর সেই জলন্ত আগুনের বেড়া থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করতে চান? বলুন—কি আপনার ধর্ম্ম? কি আপনার কর্ত্তব্য?

দণ্ডধর। না নবাবজাদা। নবাবকে ঘরেই থাকতে দাও। ঘরে বসে তিনি খোদাতালাকে ডাকুন,—আর বাইরে থেকে আমরা ডাকি ভগবানকে। দেখি দস্যু রহিম খাঁর মাথাটা কতক্ষণ ধড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

[প্রস্থান।

জগত। নবাবজাদা!

জবর। হবে না—হবে না কুমার! এ বিদ্রোহ দমন করতে নবাবের সাহায্য পাওয়া যাবে না। যাও ভাই! বর্দ্ধমানের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তারস্বরে এই বিদ্রোহের কথা জানিয়ে দাও। ঘুমন্ত মানুষকে জোর করে টেনে তোল। হাতে দাও হাতিয়ার, জীবন পণ করে বুক ফুলিয়ে শুভাসিংহের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।

জগত। নবাবজাদা!

জবর। যদি জয়ী হও, ভাল; আর যদি পরাজয়ের কালি মাখতে হয়, তাহলে মৃত্যুর আগে তোমার ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে যেও—"ভগবান! বাংলার মসনদে ধর্ম্মপ্রাণ মোগলকে না বসিয়ে দেশপ্রেমিক বাঙালীকে বসিও—বাঙালীকে বসিও।"

[প্রস্থান।

জগত। তার আগে এই দরবারে দাঁড়িয়ে ভগবানকে বলে যাই—ভগবান! দেশভক্ত বাঙালীকে যদি বাংলার মসনদে বসাতে চাও, তাহলে নবাব ইব্রাহিম খাঁর এই ছেলেদের মত কাউকে বসাও—যে বাঙালীর দুঃখে এমনি করে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারে, যে বাংলার মাটিকে এমনি করে ভালবাসতে পারে, যে বাংলার শাসনকর্ত্তার ছেলে হয়ে পিতার গায়ে এমনি করে দেশাত্মবোধের চাবুক মারতে পারে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সুভাসিংহের প্রাসাদ।

দ্রুতপদে বিন্দুবাসিনী ও অপর্ণার প্রবেশ।

বিন্দু। না না, ছুঁয়ো না—আমার গায়ে হাত দিও না। যদি পার খানিকটা বিষ এনে দাও—তাই খেয়ে আমি মরি।

অপর্ণা। কথা শোন—জীবনটাকে এমনি করে শেষ করে দিও না।

বিন্দু। কিসের জীবন? কি শুনব তোমার কথা? পাঠানদস্যু যখনই আমার গায়ে হাত দিয়েছে—তখনই আমার নারীজীবনের সব শেষ হয়ে গেছে!

অপর্ণা। কে বল্‌লে? কথা শোন—শীগ্‌গির এখান থেকে আমার সঙ্গে চলে এস।

বিন্দু। না, যাব না। তোমরাও এই দলের গুপ্তচর,—তোমরাও রহিম খাঁর বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমি কোথাও যাব না।

অপর্ণা। বিশ্বাস কর—আমার দাদা সুভাসিংহ রহিম খাঁর বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমি আর ছোড়দা তার পরম শত্রু। কদিন তোমাকে আটকে রেখেছে—দিনরাত চেষ্টা করছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু চোখ এড়াতে পারি না।

বিন্দু। তুমি কি জমিদারের বোন?

অপর্ণা। হাঁ। কিন্তু তুমি আর দেরী করো না,—ওরা দেখতে

পেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। বড়দা আর রহিম খাঁ কি একটা ষড়যন্ত্র করছে! তোমাকে এ পাপপুরী থেকে সরিয়ে দিতে এই উপযুক্ত সময়। এস—আর দেরী করো না।

ব্যস্তভাবে হিম্মতের প্রবেশ।

হিম্মত। হ্যাঁ হ্যাঁ, শীগ্‌গির এস! তোমার জন্য গোবর পালোয়ান বাইরে অপেক্ষা করছে। এস—চলে এস!

বিন্দু। তুমি কে?

হিম্মত। [মুখ ভেঙাইয়া] তুমি কে? হাঁদা গঙ্গারাম চিনতে পারলে না?

বিন্দু। তুমি সেদিন রহিম খাঁকে আনতে গিয়েছিলে?

হিম্মত। আজ্ঞে হ্যাঁ!

বিন্দু। কিন্তু তুমি তো মাতাল। তোমার সঙ্গে আমি কোন্ ভরসায় যাব?

হিম্মত। আফগান মুসলমানের সঙ্গে এসে যদি এখনো ঠিক থাকতে পারে—তাহলে হিন্দু মাতালের সঙ্গে গেলে আর জাতটা যাবে না। এস—চলে এস। [প্রস্থানোদ্যত]

বিন্দু। আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

হিম্মত। [রাগত স্বরে] স্বর্গে! বাবার কালে গিয়েছ কখনো?

অপর্ণা। তর্ক করে সময় নষ্ট করো না। যাও, চলে যাও; ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

বিন্দু। আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ঠক্‌বো না তো?

হিম্মত। এর চেয়ে বড় ঠকা আর তোমার জীবনে কি হতে পারে? ওগো হতভাগিনি! এস—আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দিও

না। ভয় নেই,—ছেলে যেমন মাকে নিয়ে যায়,—আমিও তোমাকে তেমনি ভাবেই নিয়ে যাব। এস—এস পাঠান অত্যাচারিতা বাংলার নারি! আজ থেকে তুমি আমার মা—আমি তোমার ছেলে—ছেলে —ছেলে।

[দুই হাতে অভ্যর্থনা জানাইতে জানাইতে হিম্মতের প্রস্থান,—সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা ও বিন্দু-বাসিনীরও প্রস্থান।

সুভাসিংহ ও রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। রাজা এই কথা বল্‌লে?

সুভাসিংহ। শুধু বল্‌লে নয়—রীতিমত চোখ রাঙিয়ে শাসিয়েও দিলে।

রহিম। তাহলে এখন তুমি কি কর্‌তে চাও দোস্ত?

সুভাসিংহ। তুমি আমাকে সাহায্য কর। এস—একসঙ্গে বর্দ্ধমান আক্রমণ করি।

রহিম। তারপর?

সুভাসিংহ। লুটের মাল তোমারই থাকবে, এক কণাও আমি নেব না। আমি শুধু চাই রাজকন্যাকে।

রহিম। জমিদারের কথা শেষ পর্য্যন্ত থাকবে তো?

সুভাসিংহ। বল কি পাঠান-সর্দ্দার? তোমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে আমি যদি কথার খেলাপ করি, তাহলে—

রহিম। তাহলে?

সুভাসিংহ। তাহলে তোমার আফগান-বাহিনী নিয়ে তুমি আমার চেতোয়া অধিকার করে নিও।

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাবাস—সাবাস দোস্ত!

সুভাসিংহ। আর তোমার কথা যদি ঠিক না থাকে?

রহিম। তাহলে আমার দস্যুবাহিনী নিয়ে আমি চিরকাল তোমার গোলামী করব।

সুভাসিংহ। চমৎকার! চমৎকার! তাহলে এস রহিম খাঁ! তোমার শক্তি আর আমার শক্তি একসঙ্গে মিলিয়ে আজ বাংলার বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালি। সেই আগুনের জ্বলন্ত শিখায় বর্দ্ধমানের আকাশ রাঙা হয়ে উঠুক,—বর্দ্ধমানের বুকে ঝরে পড়ুক আগুনের বৃষ্টি, আর সেই অগ্নিবৃষ্টিতে রাজা কৃষ্ণরাম রায় সবংশে পুড়ে ধ্বংস হোক।

রহিম। তবে জ্বলুক আগুন। বর্দ্ধমানকে ধ্বংস করতে একদিকে থাক সুভাসিংহের জীবন-পণ, আর একদিকে থাক পাঠান-সর্দ্দার রহিম খাঁর দস্যুবাহিনী। হত্যায়—লুণ্ঠনে বাংলার বুকে রক্তবন্যা ছুটিয়ে দেব। ঝড় উঠ্‌বে—লুটপাটের ঝড—ঝড়ের তাণ্ডবে বর্দ্ধমান কেঁপে উঠ্‌বে—বাংলার মসনদ দুলে উঠ্‌বে—আর তার কাঁপুনি গিয়ে লাগবে দিল্লীর মোগল-দরবারে।

কৃত্রিম মত্তাবস্থায় হিম্মত সিংহের প্রবেশ।

হিম্মত। দিল্লীর দরবারে লাগবার আগে আমাদের গায়ে যে কাঁপুনি লাগছে বাবা যমদূত! বর্দ্ধমান আক্রমণের আগে নিজেদের খোঁয়াড়ে যে রকম তড়পানি আরম্ভ করেছ, তাতে জমিদার-বাড়ীর খাঁচার পাখীগুলো পর্য্যন্ত আঁতকে উঠ্‌ছে।

সুভাসিংহ। হিম্মত!

হিম্মত। বল দাদা।

সুভাসিংহ। আবার তুই মদ খেয়ে আমার সামনে এসেছিস্?

হিম্মত। দেবদর্শন—বুঝলে দাদা! মাঝে মাঝে দেবদর্শন না করলে প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে ওঠে।

সুভাসিংহ। [ধমক দিয়া] তা মদ খেয়ে এসেছিস কেন হতভাগা!

হিম্মত। মদ না খেলে যে তোমার সামনে আসতে পারি না। যখন ভাল থাকি, তখন তোমাকে দেখলে বড্ড ঘেন্না করে। আর যখন মদ খাই, তখন তুমি যেন আমার কাছে সাক্ষাৎ ভগবান।

রহিম। সে কি রকম ছোটরাজা?

হিম্মত। অর্থাৎ আমার এই ছোট্ট জীবনের বিচারবুদ্ধি আর জন্ম-সংস্কার দিয়ে সাদা চোখে যখন দাদাকে দেখি, তখন দাদা আমার কাছে জীবন্ত নরক, আর মদ খেয়ে রাঙা চোখে দেখ্‌লে দাদা আমার কাছে হয়ে ওঠেন অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র।

রহিম। আর তুমি হও তার ভাই।

হিম্মত। রামভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ।

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বহুতাচ্ছা! বহুতাচ্ছা! বুঝলে দোস্ত। তোমার এই ভাইটাকে আমার ভারি ভাল লাগে। কথাগুলো যখন বলে—তখন যেন কাঁটার মত বুকে গিয়ে বেঁধে।

সুভাসিংহ। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা হতভাগা! ফের যদি মদ খেয়ে আমার কাছে আসবি—তাহলে তোকে আমি—[প্রহারে উদ্যত]

রহিম। থাক্, থাক্ দোস্ত! ভাইজান তোমার মিছে কথা বলে নি। সত্যই ওর কলিজার মধ্যে আর একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে। মদের নেশায় সে বেহুঁস। তোমার ধমকানিতে সে জেগে উঠ্‌লে হয়তো তোমার গলা টিপে ধরবে।

সুভাসিংহ। না না, ছোটবেলা থেকে আদর পেয়ে দিন দিন একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। হতভাগার এত সাহস যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই বিরুদ্ধে সমালোচনা করে।

হিম্মত। দোষ কি দাদা! ইতিহাসটা খুলে দেখ—আমার মত হতভাগ্য মাতাল অনেক খুঁজে পাবে। তবু তো আমি লক্ষ্মণের মত তোমাকে ভক্তি করি—পূজা করি। তুমি আদেশ দাও—আমি মাথা পেতে নিই। তুমি চাবুক মার—আমি হাসিমুখে পিঠ পেতে দিই। নরকের জঘন্য পঙ্ক-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আমি তোমার জন্য মাণিক তুলে আনি, কিন্তু ঘরশত্রু বিভীষণের মত বাইরের দুষমনকে ডেকে এনে তোমার মৃত্যুবাণ দেখিয়ে দিই না দাদা!

সুভাসিংহ। তুই এখান থেকে যাবি কি না বল্?

হিম্মত। যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি। কিন্তু যাবার সময় বলে যাই—পাপ-পুণ্যের পাশাখেলায় যদি তুমি হেরে যাও, তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি জেতো, তাহলে মনে রেখ দাদা! তোমার আকাঙ্ক্ষিত দ্রৌপদীকে তুমি তো পাবেই না, তার ওপর বস্ত্রহরণের সময় আমি কিন্তু লক্ষ্মণ না হয়ে বস্ত্র-যোগানদারী শ্রীকৃষ্ণ হয়ে দেখা দেব—হাঁ!

[প্রস্থান।

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সুভাসিংহ। হতভাগা বড্ড বেড়ে উঠেছে। শাসন করতে হবে। নইলে ওই একদিন ঘরশত্রু বিভীষণ হয়ে আমার জীবনটাকে শেষ করে দেবে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুত অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। বড়দা! বড়দা! শীগ্‌গির এস।

সুভাসিংহ। কেন—কেন, কি হয়েছে?

অপর্ণা। তোমাদের এই নাক-কাটা খাঁ সাহেব সেদিকে যে বউটাকে ধরে এনেছে—

রহিম। হাঁ হাঁ, কি হয়েছে—কি হয়েছে তার?

অপর্ণা। আমাদের প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে।

রহিম। পালিয়ে গেছে? কখন—কেমন করে?

অপর্ণা। একটু আগে—ধূলো দিয়ে।

সুভাসিংহ। পাইক বরকন্দাজ সব কোথায় ছিল?

অপর্ণা। তারাই তো তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

সুভাসিংহ। তবে? এত লোকের মাঝখান থেকে সে পালালো কি করে?

অপর্ণা। ধূলো—ধূলো। মুঠো মুঠো ধূলো ছড়িয়ে সবার চোখে সরষে ফুল দেখিয়ে গেল।

সুভাসিংহ। তার মানে?

অপর্ণা। ভেতরে গিয়ে দেখ—জলতে জলতে সবার চোখ ফুলে একেবারে ঢোল। রক্ত জবারমত লাল হয়ে উঠেছে। কারও মুখে টু শব্দ নেই। যন্ত্রণায় সব ছটফট করছে!

সুভাসিংহ। বলিস কি?

অপর্ণা। হাঁ। তাকে ধরবার জন্য আমিও কিছুদূর ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরে বাবা! কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! আমাকে দেখেই আবার কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো ধূলো ছুঁড়তে আরম্ভ করল। তাই না দেখে—

রহিম। কুচ্ পরোয়া নেই। কোথায় পালাবে? পাঠানদস্যু রহিম খাঁর শিকার কবরের তলায় গিয়েও নিস্তার নেই। [প্রস্থানোদ্যত]

একটু অপেক্ষা কর দোস্ত! বাঁদীর বাচ্চীকে ধরে আনি—তারপর আবার মোলাকাৎ করব তোমার সঙ্গে—গোপনে বর্দ্ধমান আক্রমণ করতে। [পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

সুভাসিংহ। কিন্তু খাঁ সাহেব! এই অন্ধকারে তুমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবে?

রহিম। ডাকাতের চোখে রাত্রেও আলো জ্বলে দোস্ত! সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও ডাকাত রহিম খাঁর চোখ দুটোকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না। ধরা তাকে দিতেই হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

হিম্মত সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

হিম্মত। তাই কখনো হয় বাবা যমদূত! তুমি বিদেশী আফগান পাঠান, আর আমরা হলাম বাঙালী হিন্দু। তুমি আমাদের দেশে এসে আমাদের মা-বোনের ওপর অত্যাচার করবে—তাদের ইজ্জৎ কেড়ে নেবে, আর আমরা তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ......

[অপর্ণাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলে অপর্ণা সকলের অজ্ঞাতে সেখান হইতে চলিয়া গেল]

রহিম। ছোটরাজা!

হিম্মত। আর বাবা ছোটরাজা। যতই ধমকানি দাও—আর যতই চোখ রাঙাও, তোমার বারোটা বেজে গেছে বাবা যমদূত।

রহিম। দোস্ত!

সুভাসিংহ। কি করি বল তো খাঁ সাহেব? হতভাগা যে আমায় অতিষ্ঠ করে তুললে? হিমে! বারবার আমাদের কাজে বাধা দিলে ভাই বলে আর তোকে ক্ষমা করব না। এমন শাস্তি তোকে দেব—যার কথা মনে করে সারাজীবন তোকে চোখের জল ফেলতে হবে।

হিম্মত। আমার চোখ দিয়ে জল পড়লে তোমার চোখ দিয়ে পড়বে কিন্তু রক্ত। কারণ—আমার মত ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে হারালে তোমার বাবার চোদ্দপুরুষেও আর পাবে না।

সুভাসিংহ। অসভ্য মাতাল! তবে আর তোকে ক্ষমা করব না। [চাবুকের প্রহার]

রহিম। দোস্ত! ভাইকে চাবুক মেরে শাসন করার আগে খুঁজে দেখ তার দোষ কোথায়—ব্যথা কোথায়—জীবনের কোনখানে ওর ঘা হয়েছে। তা নইলে তোমার শাসন ব্যর্থ হবে—দেবতার মত ভাইকে হারাবে—আর ঐ চাবুকের পাল্টা আঘাত গিয়ে পড়্‌বে তোমার পিঠে।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে :—রাজবাড়ী ঘেরাও কর,—
ডাকাত রহিম খাঁকে বন্দী কর'—]

সুভাসিংহ। একি! কিসের কোলাহল? রাজবাড়ী ঘেরাও করতে কারা এসেছে?

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মৃত্যুর ডাক! ধ্বংসের আহ্বান! রক্তের নেশা।

সুভাসিংহ। খাঁ সাহেব!

রহিম। তাইতো। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

সুভাসিংহ। হঠাৎ এ সময়ে তোমাকে বন্দী করতে—তবে কি বর্দ্ধমান-রাজ আমার প্রাসাদ আক্রমণ করলে?

রহিম। বোধহয় তাই। চল দোস্ত! কোন ভয় নেই। পাঠান দস্যুসর্দ্দার জীবনের পরোয়া করে না। আসুক সৈন্য—আসুক বর্দ্ধমানরাজ,, রহিম খাঁ একাই তার সঙ্গে লড়াইয়ের খেল দেখাবে। [প্রস্থানোদ্যত]

ছুটিতে ছুটিতে আরও ব্যস্তভাবে অর্পণার পুনঃ প্রবেশ।

অর্পণা। বড়দা! বড়দা! সর্ব্বনাশ হয়েছে! রাজার সৈন্য আমাদের প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।

সুভাসিংহ। রাজার সৈন্য।

অর্পণা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্দ্ধমানের সৈন্য।

সুভাসিংহ। পাইক বরকন্দাজরা সব কোথায়?

অর্পণা। তারা সব ওদের ভয়ে পালিয়েছে।

সুভাসিংহ। পালিয়েছে? এই বিপদের সময় শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা না করে তারা প্রাণের ভয়ে পালালো? খাঁ সাহেব! আর দেরী নয়—চল, প্রাসাদের ওপর থেকে বন্দুক চালিয়ে রাজার সৈন্য খতম করে দিই! [উচ্চ চীৎকারে] খবরদার! কেউ পালিয়ে যাস্‌নে! সবাই অস্ত্র নিয়ে প্রাসাদের চারিদিকে পাহারা দে—রাজার সৈন্য যেন প্রাসাদে ঢুকতে না পারে।

[দ্রুত প্রস্থান।

রহিম। প্রাসাদে ঢুকলেও নিস্তার নেই। রহিম খাঁর ভেল্‌কী-বাজীতে বর্দ্ধমানের সৈন্য ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, মুণ্ডগুলো ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে,—রক্তের নেশায় পাগল হয়ে আমার পাঠান বাহিনী বর্দ্ধমান রাজ্য ছারখার করে দেবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

অর্পণা। ও খাঁ সাহেব। আমরা তা'হলে এখন কি করব?

রহিম। হাতিয়ার নাও—লড়াই কর—দুষমনকে হটিয়ে দিতে তোমাদের জান কবুল কর। [পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

হিম্মত। আমরা জান কবুল করলে তোমার কবরটা কে খুঁড়বে বাবা যমদূত?

রহিম। ডাকাত রহিম খাঁর কবর খোঁড়ার সাধ্য তোমাদের নেই—আর তার কবরের জায়গাও এই বাংলার মাটিতে নেই।

[প্রস্থান।

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ-অর্পণা! বুদ্ধির খেলটা তা'হলে একবার খুব দেখানো গেল, কি বলিস?

অর্পণা। হ্যাঁ ছোড়দা! বলিহারি তোর মাথা। ইচ্ছে হ'চ্ছে তোর পায়ের ধূলো খানিকটা মাথায় তুলে নিই।

হিম্মত। ফাঁকা আওয়াজ করলাম—বিন্দুবাসিনী হলো পগার পার, রহিম খাঁ ছুটে যাচ্ছিল—মিছেমিছি হৈ-চৈ করে তাকে আটকালাম, বর্দ্ধমানের সৈন্য এসেছে বলে ভাঁওতা দিয়ে দুজনকেই লুকিয়ে দিলাম। ব্যস্—এইবার তুই আর আমি—

অর্পণা। কি করবি?

হিম্মত। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে মানুষ গড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠা করিগে চল। যেখানে শুভাসিংহের মত কয়েকটা অত্যাচারী রাজ্যলোভী জমিদার তৈরী না হয়ে সত্যিকারের গোটা কতক দরদী মানুষ তৈরী হবে, যারা দেশকে ভালবাসবে—দেশের মাটিকে ভালবাসবে—বিধর্ম্মীর সাথে হাত মিলিয়ে নিজের দেশকে পরের পায়ে দাসখৎ লিখে দেবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৰ্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ।

কৃষ্ণরাম ও জগতরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণরাম। তারপর? তারপর বলে যাও জগত?

জগত। নবাব ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহকে কিছুই না বলে উড়িয়ে দিতে চান।

কৃষ্ণরাম। কেন?

জগত। তিনি মনে করেন মানুষ এত নৃশংস হতে পারে না। সুভাসিংহকে যদি আমরা আমল না দিই, তাহ'লে এই বিদ্রোহ আস্তে আস্তে থেমে যাবে।

কৃষ্ণরাম। তুমি বললে না যে, সে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে চায়?

জগত। বলব কাকে? দুদিন অপেক্ষা করেও নবাবের দেখা পেলাম না। নবাবজাদা জানালেন—অকারণ রক্তপাত করে নবাব কারও মনে কষ্ট দিতে চান না।

কৃষ্ণরাম। তাহ'লে শেষ কথা তুমি কি বলে এলে?

জগত। আমাকে বলতে হয় নি। নবাবজাদাই আমাদের কথা বাংলার শাসনকর্ত্তাকে জানাবেন।

কৃষ্ণরাম। তাহ'লে নবাবের ছেলে জবর খাঁ মনে প্রাণে এই বিদ্রোহকে ঘৃণা করে?

জগত। শুধু ঘৃণা করে না—এমন কি সে তার পিতার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের এই বিপদে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে।

কৃষ্ণরাম। বল কি?

জগত। তার চোখে দেখেছি আগুনের ফুল্‌কি—অন্তরে দেখেছি জলন্ত দেশপ্রেম—মুখের কথায় বুঝতে পেরেছি দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিতে শুধু বাংলার শাসনকর্ত্তা কেন—দুনিয়ায় সে কাউকে ভয় করে না।

কৃষ্ণরাম। বাঃ-বাঃ! চমৎকার! বাংলায় তাহলে মানুষ আছে—বাংলার হৃদ্‌পিণ্ড তা'হলে এখনো শুব্ধ হয়ে যায় নি,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে প্রতিবাদ করবার মত সাহসী মানুষ এখনো বাংলায় আছে।

সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। শুধু বাংলায় নয়—ভারতেও আছে মহারাজ!

কৃষ্ণরাম। ভারতেও আছে? তাহ'লে কি সম্রাট ঔরঙ্গজীব—

সৌবীর্য্য। আপনার অভিযোগ পেয়ে অবিলম্বে যাতে এই বিদ্রোহ দমন করা যায়—তারই নির্দ্দেশ দিয়ে বাংলার শাসনকর্ত্তাকে কড়া চিঠি লিখেছেন।

কৃষ্ণরাম। তুমি কি করে জানলে?

সৌবীর্য্য। আমাদের দূত ফিরে এসেছে। দূত মুখে তিনি আরও জানিয়েছেন—প্রয়োজন হলে রহিম খাঁ আর সুভাসিংহের অত্যাচারকে বন্ধ করতে তিনি ভবিষ্যতে দিল্লী থেকে প্রতিনিধিও পাঠাতে পারেন।

কৃষ্ণরাম। তাহ'লে আর ভাবনা নেই। বাংলার শাসনকর্ত্তা

আমাদের সাহায্য না করলেও দিল্লী আমাদের সাহায্য করবে।

জগত। কিন্তু তার আগেই যদি সুভাসিংহ আক্রমণ করে?

সৌবীর্য্য। সে আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের শক্তি আছে কুমার!

জগত। শক্তি আছে—কিন্তু অস্ত্র নেই।

ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। অস্ত্র থাকলেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না দাদা!

জগত। তবে?

সত্যবতী। অস্ত্রের সঙ্গে চাই অটুট মনোবল। দেশের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে জাতির মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। নাই বা থাকল অস্ত্র, নাই বা রইল সৈন্য, জাতির ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোল, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে দেশ ও মাটির চেয়ে বড় জিনিষ নারীর মর্য্যাদা।

সৌবীর্য্য। সেই মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমরা তো বর্দ্ধমানের ঘরে ঘরে জাগরণের মন্ত্র ঢেলে দিয়েছি রাজকুমারী।

সত্যবতী। কিন্তু জেগেছে কই? সাড়া কোথায়? দামোদরের বন্যার মত দেশের ঘুমন্ত শক্তি ছুটেছে কই? কই তার সংকেত?

কৃষ্ণরাম। সত্য!

সত্যবতী। কোথায় সে আহ্বান? কোথায় তার উদ্বোধন? কে দেবে তার অগ্নি-দীক্ষা?

জগত। সত্য!

সত্যবতী। মোগলের পদভারে জাতির অস্থিপঞ্জর আজ ভেঙে গেছে, পাঠানের দুরন্ত পদাঘাতে হিন্দুর দেবালয় চূর্ণ, নারীর বুকফাটা

আর্ত্তনাদে বাতাস ভরে উঠেছে, কে করবে তার প্রতিকার? কে মোছাবে তাদের চোখের জল? কে ফিরিয়ে আনবে তাদের লাঞ্ছিত জীবনের হারানো মর্য্যাদা?

জগত। আমরা—আমরাই ফিরিয়ে আনব তাদের লুণ্ঠিত মর্য্যাদা,—আমরাই ঘুচিয়ে দেব নারীর লাঞ্ছনার অশ্রুজল,—হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত আমরাই তুলে ধরব বাংলার জাতীয় নিশান।

সত্যবতী। তবে কেন দিল্লীর দিকে চেয়ে আছ? তবে কেন বাংলার শাসনকর্ত্তার কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছ? কেন সুভাসিংহের চেতোয়া বর্দ্দোয়া আজও রক্ত-প্লাবনে ভাসিয়ে দাওনি? কেন শয়তান রহিম খাঁ আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? কেন তার অত্যাচারে ঘরে ঘরে কান্নার রোল? বাতাসে কেন আজ করুণ আর্ত্তনাদ?

কৃষ্ণরাম। সত্য! সত্য, মা! ওরে তুই কি আমার সেই সত্য—যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত দানবের পদাঘাত সহ্য করেছে—তবু তার নারীত্ব বিলিয়ে দেয়নি? তুই কি ভারতের সেই শক্তিময়ী নারী—যার রুদ্রাণী রূপের পায়ে কত অত্যাচারীর মাথা নত হয়ে গেছে—তবু তার সতীত্ব নষ্ট হয়নি? তুই কি বাংলার সেই জীবন্ত জাগ্রত মা—যার একহাতে বাজে নির্ভয়ের মঙ্গল-শাঁখ, আর একহাতে ঝল্‌সে ওঠে রুদ্রাণীর খড়্গ?

সৌবীর্য্য। এমন শক্তিময়ী নারী যাদের ঘরে—আসুক না সুভাসিংহ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে,—আসুক না পাঠানদস্যু রহিম খাঁ তার ডাকাতের হিংস্র ক্ষুধা নিয়ে,—মহারাজ! জয় আমাদের অনিবার্য্য, ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল, ক্ষয় আমাদের হতে পারে—কিন্তু লয় কখনো হতে পারে না। [প্রস্থান।

জগত। সুজাসিংহ মরবে—রহিম খাঁ কবরে যাবে। বাংলার বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে। দেশদ্রোহীর তাজা রক্তে সিক্ত হয়ে বাংলার জাতীয় নিশান রাঙা হয়ে উঠ্‌বে, আর সেই রক্ত রাঙা পতাকা নিয়ে বাঙালী ছুটবে তাদের স্বাধীনতার জন্য, ভেঙে ফেলবে দাসত্বের শৃঙ্খল, গাইবে আমার বাংলা মায়ের বন্দনা গান।

তরবারি হাতে গীতকণ্ঠে রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম।—   গীত।

জয় বাংলার জয়।
জয় বাংলা মায়ের জয়।
হিমালয় কুমারী কন্যা
নাহি নাহি তার ভয়।
আসুক ঝঞ্ঝা বজ্র আহবে
শত শত বাধা চূর্ণিত হবে।
বাংলা মায়ের জয় গৌরবে
ভরিবে বিশ্বময়।
নাহি নাহি তার লয়।

সত্যবতী। অস্ত্র ধরেছিস রাজারাম?

রাজারাম। তুই যে ভাবে ডাক দিলি, তাতে কি আর অস্ত্র না ধরে থাকতে পারি?

সত্যবতী। শত্রুর সামনে ঠিক এমনি করে দাঁড়াতে পারবি?

রাজারাম। শুধু দাঁড়াব না—শত্রু বুকে এই তরবারি বসিয়ে দিয়ে তার বুকের রক্ত পান করব।

জগত। সাবাস রাজারাম! ঠিক এমনি করে হাতের তরবারি হাতেই ধরে রাখিস্—যেন শত্রুর আঘাতে ঐ তরবারি খসে না

পড়ে। মরিস যদি, দাঁড়িয়ে মরবি, মাটিতে লুটিয়ে পড়িস নে। রক্ত যদি দিতে হয়—দাঁড়িয়ে বুক চিরে রক্ত দিবি—তবু বর্দ্ধমান রাজবংশের এক ফোঁটা রক্ত যেন শত্রুর পায়ে ঢেলে দিস নে।

রাজারাম। তাই করব দাদা! আমার বালক সৈন্যদল নিয়ে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মরব—তবু এ মাথা শত্রুর পায়ে নুইয়ে দেব না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। তুমিও যাও জগত! সৈন্য-সজ্জার যতটুকু বাকী আছে—এই কদিনের মধ্যে শেষ করে নাও। সত্য! তুইও যা মা! পুরনারীদের হাতে হাতে অস্ত্র তুলে দে। বিপদের সময় যাতে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে, সে ভার আমি তোকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চাই।

সত্যবতী। তুমি কিছু ভেব না বাবা। ডাকাত রহিম খাঁ আসবে ধনরত্ন লুট করতে,—নারীর অন্দর-মহলে সে ঢুকবে না।

জগত। কিন্তু সুভাসিংহ?

সত্যবতী। সুভাসিংহের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। শয়তান একবার যদি ভেতরে যায়,—তাহলে বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ থেকে আর তাকে জীবনে বাইরে আসতে হবে না, ঐ অন্ধকারেই তাকে সারাজীবন ঘুমিয়ে থাকতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত সৌবীর্য্যের পুনঃ প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। মহারাজ!

কৃষ্ণরাম। আবার এলে যে সৌবীর্য্য!

সৌবীর্য্য। এইমাত্র গুপ্তচর এসে সংবাদ দিলে—

জগত। কি সংবাদ দিলে?

সৌবীর্য্য। রহিম খাঁ চেতোয়ায় স্বভাসিংহের প্রাসাদে এসেছে।

কৃষ্ণরাম। তারপর?

সৌবীর্য্য। দু'জনে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এই সাব্যস্ত করেছে—

কৃষ্ণরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল!

সৌবীর্য্য। লুটের ধনরত্ন যা পাওয়া যাবে—তা সব নেবে রহিম খাঁ। আর—

জগত। আর স্বভাসিংহ?

সৌবীর্য্য। স্বভাসিংহ লুটের মাল এক কণাও নেবে না। সে চায়—

কৃষ্ণরাম। কি চায়?

সত্যবতী। আমাকে।

[সকলে চমকিয়া উঠিল]

জগত। সত্যবতী!

সত্যবতী। দাদা! নারীর সব চেয়ে বড় জিনিষ কি জান? তার নারী-রত্ন। সে রত্ন কোথায় লুকিয়ে থাকে তা জান? অন্তরে। সে রত্ন কেড়ে নেওয়া যেমন সহজ নয়—তেমনি তার সন্ধান পাওয়াও বড় মুখের কথা নয়। [প্রস্থানোদ্যত]

জগত। তোর মুখের কথাই যেন সত্য হয় বোন।

সত্যবতী। সত্য হবে। চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য—দিনরাত যেমন সত্য—তেমনি আমার মুখের কথাও সত্য হবে। মনে রেখো দাদা! নারীর নারীত্ব একটা মাটির ডেলা নয় যে আঘাত করলেই তা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। [প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। সৌবীর্য্য! জগত! আমার রাজ্য, সিংহাসন, ধনরত্ন সব থাক, শুধু আমার মান মর্য্যাদাকে তোমরা লুণ্ঠিত হতে দিও না। বিলিয়ে দিও না সুভাসিংহের হাতে নারীর অমূল্য সম্পদ।

[প্রস্থান।

জগত। না, বিলিয়ে দেব না। একজন সুভাসিংহ কেন, হাজার হাজার সুভাসিংহ এলেও পারবে না আমাদের হাত থেকে জীবন্ত সত্যবতীকে ছিনিয়ে নিতে। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত রাজারামের পুনঃ প্রবেশ।

রাজারাম। দাদা! দাদা! শীগ্‌গীর এস।

জগত। কেন—কি হয়েছে?

রাজারাম। আমাদের যে সমস্ত সৈন্য নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল—

জগত। তাদের কি হয়েছে?

রাজারাম। তারা একটা জলে-ডোবা বউকে ধরে এনেছে।

সৌবীর্য্য। জলে-ডোবা বউ?

রাজারাম। হ্যাঁ সেনাপতি মশায়। বউটা দামোদরের জলে ভেসে যাচ্ছিল। সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাকে জল থেকে তুলে এনেছে।

জগত। সেকি! কই—চল্‌তো দেখি।

রাজারাম। আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সুভাসিংহের প্রাসাদ।

পত্রপাঠরত সুভাসিংহের প্রবেশ।

সুভাসিংহ। "বিদ্রোহ বন্ধ কর—অকারণ রক্তপাত"—দিল্লীর হুকুম—নবাব ইব্রাহিম খাঁর আদেশ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—নবাব ইব্রাহিম খাঁ। তোমার আদেশে রাজা কৃষ্ণরাম রায় চলতে পারে—বেনিয়া ইংরাজ তোমার হুকুমে মাথা পেতে দিতে পারে—কিন্তু চেতোয়ার জমিদার সুভাসিংহ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—বাংলার শাসনকর্ত্তা দূরে থাক্—দিল্লীর হুকুমকেও সে গ্রাহ্য করে না—কুর্নিশ করে না তার এই সু-উচ্চ মস্তক।

রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। দোস্ত!

সুভাসিংহ। এস খাঁ সাহেব! শুনেছ বোধহয় দিল্লী থেকে হুকুম এসেছে—অবিলম্বে এই বিদ্রোহ বন্ধ না করলে আমাদের দু'জনকে দিল্লীর দরবারে অভিযুক্ত হতে হবে।

রহিম। আরে রেখে দাও তোমার দিল্লীর হুকুম। পাঠানের কলিজায় এক ফোঁটা খুন থাকতে মোগলের হুকুম সে মানবে না।

সুভাসিংহ। বাংলার শাসনকর্ত্তা আদেশ পাঠিয়েছে—

রহিম। আদেশ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—বাংলার শাসনকর্ত্তা! কে, সেই আফিংখোর বুড়োটা? দোস্ত! বাংলার শাসনকর্ত্তাকে ভয় করলে এই পাঠান অনেকদিন আগেই বাংলার মাটি থেকে খতম হয়ে যেত।

সুভাসিংহ। বিশেষতঃ তোমার মত শক্তিশালী পাঠান সর্দ্দার—সে ভয় করতে যাবে তুচ্ছ বাংলার নবাবকে ?

রহিম। আমরা চাই তামাম ভারতের বুক থেকে মোগলকে ধ্বংস করতে। পাঠানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা যেমন অত্যাচার চালিয়েছে, আমরাও তেমনি মোগল শক্তিকে চূর্ণ করতে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, এমন কি রাজমহল পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে তুলব,—বাংলা দেশের সমস্ত মানুষ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের জ্বালায় পাগল হয়ে যাবে,—মোগলবাদশাহের পয়জার মাথায় নিয়ে আজও যে সমস্ত জায়গীরদার ও জমিদার দিল্লীর পদলেহন করছে—তাদের আমি শায়েস্তা করে দেব।

দণ্ডধরের প্রবেশ।

দণ্ডধর। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্তি দাও—শাস্তি দাও শয়তান রহিম খাঁকে।

রহিম। [চাবুক প্রহার] শয়তান রহিম খাঁকে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দণ্ডধর। কে—কে তুই ? ও, চিনতে পেরেছি। তুই সেই ডাকাত—যে আমার বিন্দুকে ডাকাতি করে এনেছে। বল্—বল্ শয়তান! কোথায় আমার বিন্দু ?

রহিম। জাহান্নামে। [পুনরায় প্রহার]

সুভাসিংহ। খাঁ সাহেব!

রহিম। সেদিন যে আওরতটা পালিয়ে গেল এ বেকুব তারই খসম।

সুভাসিংহ। ও—এরই স্ত্রীকে তুমি সেদিন ধরে এনেছিলে ?

দণ্ডধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজাবাবু! চাবুক মারতে মারতে আমারই

চোখের ওপর দিয়ে এই শয়তান তাকে ধরে এনেছে। কত কেঁদেছি—কত চোখের জল ঢেলেছি—কিন্তু ঐ কুত্তার বাচ্চা আমার বুকে লাথি মেরে—

রহিম। চোপরাও বাঁদীর বাচ্চা। [পুনরায় প্রহার]

দণ্ডধর। উঃ—

গীত।

কত আর মারবি চাবুক
　মার নারে তুই বারে বারে।
তবু এই শিড়-দাঁড়া মোর
　কিছুতেই যে ভাঙ্‌বে নারে।
যত তোর পায়ের দাপে,
এ মাটির বক্ষ কাঁপে,
তত তোর কবরখানার
　দোর খুলে যায় একেবারে।

দণ্ডধর। আমি যাই—আমি যাই। চাবুকের ঘায়ে এই নরপশুর অত্যাচারে আমার বিন্দুর দেহটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। যাই খুঁজে দেখি, যদি তাকে পাই—তা'হলে শোন্ অত্যাচারি! তার মরা দেহটা এনে তোর পায়ে উপহার দেব, শেয়াল শকুনীর মত তুই তার মাংস ছিঁড়ে খাস—মাংস ছিঁড়ে খাস।

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। লোকটা বড় ক্ষেপে গেছে খাঁ সাহেব।

রহিম। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দেখো দোস্ত! ওরাই একদিন আমাদের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে দুষমনের সঙ্গে লড়াই করবে।

সুভাসিংহ। তা'হলে আর দেরী নয়। আস্‌ছে অমাবস্যার অন্ধকারে বর্দ্ধমান আক্রমণ করতে হলে এখনই রওনা হ'তে হবে।

রহিম। হবে নয়—হয়ে গেছে।

সুভাসিংহ। তা'হলে বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কি আজই রওনা হতে চাও?

রহিম। জরুর! সেই জন্যই তো আসা। তোমার বাহিনী নিয়ে তোমাকেও আজ আমার সঙ্গে রওনা হতে হবে।

সুভাসিংহ। বেশ! আমার বাহিনী তো তৈরীই আছে। শুধু তোমার অপেক্ষায়—

রহিম। না না, আর অপেক্ষা নয়। এস দোস্ত! [প্রস্থানোদ্যত] হ্যাঁ—তোমার ভাইটি কোথায়?

সুভাসিংহ। হিম্মত? তাকে তো আজ দু'দিন প্রাসাদে দেখছি না। হয়তো কোথাও মাতাল হয়ে বেহুঁস্ অবস্থায় পড়ে আছে।

রহিম। তাকে যে আমার চাই দোস্ত।

সুভাসিংহ। কেন—তাকে নিয়ে কি করবে?

রহিম। সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে। আমার মনে হয় সেদিন সেই হিন্দু আওরাতকে তোমার ভাই আর বহিন ষড়যন্ত্র করে এই প্রাসাদ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। মনে রেখো দোস্ত! এ যুদ্ধে যদি আমাদের বর্দ্ধমানের পরজায় খেতে হয়—তা হবে তোমার ঐ ভায়ের জন্য।

সুভাসিংহ। বল কি? ভাই হয়ে সে আমার সর্ব্বনাশ করবে। এত সাহস হবে তার?

রহিম। হবে—হবে। আমি তাকে চিনতে পেরেছি। তার মগজের মধ্যে খুব দামী জিনিষ লুকিয়ে আছে। বহুতাচ্ছা খেলোয়াড়, পাকা ওস্তাদ। আমার চোখে সে ধূলো দিয়েছে।

সুভাসিংহ। তাই যদি হয়, তাহলে ভাই বলে আমার কাছে রেহাই পাবে না। আমার সংকল্পসাধনের জন্য দরকার হয় আমি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

রহিম। তবে আর দ্বিধা নেই। চালাও অভিযান! চালাও লুণ্ঠন। বর্দ্ধমানকে ধ্বংস কর—বাংলার শাসন-কর্ত্তার উপযুক্ত জবাব দাও—দিল্লীর গম্বুজগুলো কাঁপিয়ে তোল। অমাবস্যার কালো আঁধারে গঙ্গা-দামোদরের বুকে বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে তোল। বর্দ্ধমান-বর্দ্ধমান!—

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। বর্দ্ধমান! রাজা কৃষ্ণরাম রায়! এইবার বুঝিয়ে দেব তোমার দাম্ভিকতার পরিণাম! তুমি যত বড়ই হও—যেখানেই তুমি লুকিয়ে থাক,—আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। তোমাকে ধ্বংস করব—তোমার উঁচু মাথা নুইয়ে দেব—তোমারই চোখের ওপর দিয়ে টেনে আনব আমার মানসী প্রতিমা তোমার কন্যাকে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের বহিরাংশ।

ক্রন্দনরতা বিন্দুবাসিনী ও সত্যবতীর প্রবেশ।

বিন্দু। কেন আমাকে বাঁচালে? কেন আমার এই কলঙ্কিত দেহ নদীর জল থেকে তুলে আন্‌লে? আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কেমন করে এ পোড়া মুখ সমাজের কাছে দেখাব?

সত্যবতী। বাংলা দেশের কেউ তোমাকে ঠাঁই না দিলেও আমরা তোমাকে রেখে দেব! ভয় কি? তুমি সারাজীবন এখানে থাকবে।

বিন্দু। ওগো, না না! তোমরাও আমাকে রাখতে পারবে না। আমাকে মরতেই হবে।

সত্যবতী। মরতে তোমাকে দেব না—তোমাকে বাঁচতে হবে।

বিন্দু। বেঁচে থেকে কি করব? ডাকাত যে আমার সব কেড়ে নিয়েছে।

সত্যবতী। প্রতিশোধ নিতে পারবে না?

বিন্দু। প্রতিশোধ?

সত্যবতী। হ্যাঁ। যারা তোমার উপর অত্যাচার করেছে—যারা বাংলার নারীকে অপমান করেছে, পারবে না তাদের মুখে তোমার বুকের সমস্ত জ্বালা উগ্‌রে দিতে?

বিন্দু। রাজকন্যা! একি শোনালে? একি মন্ত্র আমার কানে ঢেলে দিলে?

সত্যবতী। বল—পারবে কি না?

বিন্দু। হ্যাঁ, পারব—নিশ্চয়ই পারব। কিসের সমাজ? বিধর্ম্মী আমাদের নারীত্ব কেড়ে নেবে—পথে ঘাটে বে-ইজ্জৎ করবে—আর আমরা তাই মুখ বুঁজে সইব?

সত্যবতী। এতদিন কেন সয়েছ? যে হাতে রহিম খাঁ তোমায় স্পর্শ করেছে, যে হাতে চাবুক মেরেছে, সেই হাতখানা তার ভেঙে দিতে পারনি? মাথার কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাঘিনীর মত রুখে দাঁড়াতে পারনি?

বিন্দু। এইবার পারব। এতদিন তো কেউ বলেনি? সবাই চাবুক খেয়েছে—জবাব দেয়নি কেউ। ওগো রাজকন্যা! তুমি ভয় ভেঙে দিয়েছ—তুমি ঘোমটা খুলে দিয়েছ, লজ্জার ঘরে আগুন দিয়ে তুমি আজ বাংলার নারীকে টেনে বার করেছ।

বেদে ও বেদিনী বেশে হিম্মত ও অর্পণার প্রবেশ।

হিম্মত। [দূর হইতে সুরে] খেলা দেখবে গো—সাপের খেলা—

অর্পণা। [সুরে] বাত ভালো—বেদনা ভালো—দাঁতের বেথা—মাজার বেথা ভালো—

সত্যবতী। কে তোমরা?

হিম্মত। হামরা সাপুড়ে আছে গো!

অর্পণা। সাপ খেলাই—খেলা দেখাই—বাত-বেদনা ভালো করি।

হিম্মত। বাচ্চা হোয় না—সুখ হোয় না—শান্তি নেই—মাথা ঘোরে—মাজা কোচ্ কোচ্ কোরে,—আরো বাবা কেত্তো রকম দাওয়াই আছে।

সত্যবতী। হাত দেখ্তে পার?

হিম্মত। হাঁ হাঁ,—ও হামরা সোব পারে রাজার বেটি! বোল্‌ না—কি বোল্‌তে হোবে। সাদী—ভালোবাসা—পরলোক হাপন করা —বশীকরণ সোব হামরা জানে।

সত্যবতী। এর হাতখানা দেখে বলতো—এর জীবনে কি ঘটেছে? [বিন্দুকে দেখাইয়া দিল]

হিম্মত। হাঁ হাঁ, বোলবে। সোব কোথা বোলিয়ে দিবে। দেখা—হাত দেখা বেটি! [অর্পণা চুপি চুপি হিম্মতের কানে কানে কি বলিল] হাঁ হাঁ—ও হামি বুঝিয়েছে।

[বিন্দুবাসিনী সলজ্জভাবে হাত বাড়াইয়া দিল।
হিম্মত বেশ গম্ভীর ভাবে তাহার হাত
দেখিতে লাগিল।]

অর্পণা। ঠিক্‌ ঠিক্‌ বোলবি কিন্তু। রাজবাড়ি আছে—বহুৎ বোখশিস্‌ মিলবে।

হিম্মত। আরে তু থাম্‌ না ঠুংরী! এত্তোকাল বাংলাদেশে বেবসা কোরছে, কেত্তো লোকের কেত্তো উপ্‌গার হোলো, আর তু হামাকে ডর দেখাচ্ছিস?

অর্পণা। লে—তাড়াতাড়ি সারিয়ে লে। খানাপিনা কোরতি হবে তো?

হিম্মত। হাঁ হাঁ, সোব হোবে—সোব হোবে। তু একটু ঠাণ্ডা হোয়ে থাক্‌তো দেখি। [হাত দেখিতে দেখিতে] হাঁ—এ তো বহুৎ ঠেকা আছে রে বেটি!—তু বোড়া গরীব মাইয়া আছিস। [পুনরায় দেখিয়া চমকিত হইয়া] আরে বাবা! হাতের মোধ্যে একি আছে রে ঠুংরী?

সত্যবতী। কি আছে? কি দেখলে?

হিম্মত। একে তো ডাকাতে ধেরিয়েছিল।

অর্পণা। ঠিক বোলছিস তো?

হিম্মত। হাঁ রে, হাঁ? ডাকাত একে লিয়ে বহুৎ কষ্ট দিয়েছে।

সত্যবতী। তারপর?

হিম্মত। একঠো রাজার ভাই আউর তার বহিন একে ছোড়িয়ে দিল। বেটি বাঁচিয়ে গেলো।

বিন্দু। হাঁ, বেঁচে গেলাম—জন্মের মত। কিন্তু সে বাঁচার বিনিময়ে কি পেয়েছি জান?

সত্যবতী। দিদি!

বিন্দু। একটা কলঙ্কের দাগ! আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা! না না—আমি বাঁচব না—বেঁচে থাকার অধিকার আমার নেই—রক্ত পর্য্যন্ত কলুষিত হয়ে গেছে। ওগো বাংলার নারি! শোননি তো আমার কথা? দেখতে পাওনি তো আমার দেহের কলঙ্ক-চিহ্ন? চোখ ঢাকো! কানে আঙুল দাও! নইলে ভয়ে শিউরে উঠবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সত্যবতী। হতভাগি! কোথায় যাচ্ছ? ভুলে গেলে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা?

বিন্দু। ও, হাঁ হাঁ—প্রতিজ্ঞা করেছি—তোমার কাছে দীক্ষা নিয়েছি। হাতিয়ার ধরতে হবে—ঘরে ঘরে ডাক দিতে হবে। প্রতিশোধ চাই—লাঞ্ছনার প্রতিশোধ। শুধু রহিম খাঁ নয়—ঐ সঙ্গে হিন্দুর কালাপাহাড় সুভাসিংহকেও সায়েস্তা করতে হবে। সে যে বাংলার মাটিতে বিষ ঢেলে দেবে, হিন্দুর টুঁটি ছিঁড়ে খাবে—পাপের পাহাড় চাপিয়ে দেবে হিন্দু সমাজের বুকে।

[প্রস্থান।

সত্যবতী। তোমরা একটু বস। আমি এখুনি আসছি।

হিম্মত। আরে ওকে লিয়ে তোর কুছ ভয় নেই আছে। একঠো কোবচ লিয়ে লে—সোব ঠিক হোইয়ে যাবে।

সত্যবতী। না-না, তোমরা বুঝতে পারছ না! ওর চেয়ে হতভাগিনী এই বাংলায় আর কেউ নেই।

হিম্মত। বোঝে—বোঝে—হামি লোক সোব বুঝতে পারে। ডাকাত উহার ধরম নষ্ট কোরিয়েছে।

অর্পণা। আরে শামলা! তোর কি মাথা খারাপ হোইয়ে গেলো?

হিম্মত। আরে তু থাম ঠুংরী। হামি যা বোলবে তা ঝুট হোতে পারে না। বোল্ রাজার বেটি, হামার কোথা সত্যি আছে কি না?

সত্যবতী। তুমি কি করে জানলে?

হিম্মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেওতার কিরপা'য় হামরা হাত দেখিয়ে সব বোলিয়ে দিতে পারে। দেখা তুহার হাত। হমনি করিয়ে তুহারও সোব বোলিয়ে দেবে।

অর্পণা। দেখা নারে বেটি! তুহার কুছু দুখ থাকবে না। হাত দেখিয়ে একটা কোবচ লিয়ে লে। ব্যাস—সব ঝোঞ্ঝাট চুকিয়ে যাবে।

সত্যবতী। তবে দেখ তো বেদে! আমার হাত দেখে বলতো এই রাজ্য কেউ আক্রমণ করতে আসবে কি না?

হিম্মত। আরে বাবা। এ তো বহুৎ বোড়ো কোথা জিজ্ঞাসা কোরলি। হাঁরে ঠুংরী। হারিয়ে যাব নাকি রে?

অর্পণা। কেনো হারিয়ে যাব? হামি মোন্তর পড়বে,—আর তু হাত দেখবি।

হিম্মত। হাঁ—হাঁ, ঠিক আছে। তোবে দে রাজার বেটি। হাত বাড়ায়ে দে। ওস্তাদের কিরপায় হামি ঠিক বোলিয়ে দেবে।

[সত্যবতী হাত বাড়াইয়া দিল। হিম্মত খুব ভাব-ভঙ্গিমা সহকারে হাত দেখিতে দেখিতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

হিম্মত। আরে বাপ রে বাপ!

অর্পণা। কি হলো রে শামলা?

হিম্মত। যুদ্ধু তো লাগিয়ে গেলো রে বেটি।

অর্পণা। লাগিয়ে গেলো?

হিম্মত। হাঁরে ঠুংরী। দুষমন তো আসিয়ে গেলো।

সত্যবতী। এসে গেল?

হিম্মত। তা আসিয়ে গেলো বইকি। বহুৎ বোড়ো শয়তান আছে। তুহার লিয়ে ওদের জুলুম,—দুষমন তুহারে সাদী করতে চায়।

অর্পণা। রাজার বেটিকে সাদী করিতে চায়?

হিম্মত। হাঁরে ঠুংরী! ও বোড়ো বদমাস আছে। একঠো দুষমনকা সাথ উহার পেয়ার হইয়ে গেলো,—লোক লস্কর—তীর কাঁড় হাতিয়ার লিয়ে উহারা বরধ্মান মুল্লুকে রওনা হইয়া গেলো।

অর্পণা। তবে তু এক কাজ কর শামলা! রাজার বেটিকে একঠো ভাল কোবচ বানিয়ে দে।

হিম্মত। হাঁ-হাঁ দুষমন আসবে—লেকিন গায়ে হাত দিতে পারবে না। যুদ্ধু হোবে—লেকিন রাজার বেটির কোন ক্ষতি হোবে না।

সত্যবতী। এমন কবচ তোমাদের কাছে আছে?

হিম্মত। হাঁরে! হামরা বনে জঙ্গলে ঘুরি—সাপ ধরি খেলা দেখাই—গাছ-গাছড়ার কেত্তো দাওয়াই লিয়ে হামরা বাংলা মুল্লুক চরিয়ে বেড়াই। হামরা তুহার সোব বিপদ কাটায়ে দেবে। লে—একঠো কোবচ নিয়ে লে।

সত্যব্রতী। তবে দাও। তোমরা যখন বলছ তখন কবচ নিয়ে দেখি তোমাদের কথা সত্যি কি না?

হিম্মত। হাঁ হাঁ, যাচাই করিয়ে দেখ্‌না বেটি? তোদের ভদ্দর লোকের কাছে এ কোবচের এক কড়িও দাম নেহি আছে,—লেকিন হামাদের মত ছোটজাতের কাছে এ দাওয়াই দেওতার আশীর্ব্বাদ। [ঝোলার মধ্য হইতে একটি চৌকা চ্যাপ্টা রূপার মত কবচ বাহির করিল।] লে—লিয়ে রাখ্‌—সঙ্গে রাখবি বুঝলি?—

সত্যবতী। কিন্তু—

অর্পণা। কুচ্ছু ভাবনা নেই। সোব বিপদ কাটিয়ে যাবে।

হিম্মত। হাঁ হাঁ, দুষমন—বদমাস সোব হোটিয়ে যাবে। লে—হাত পাতিয়ে ধর্‌। [কবচ প্রদান]

অর্পণা। হাঁরে শামলা! কোবচ যদি নোংরা হইয়ে যায়, দুষমন যদি আসিয়ে পোড়ে?

হিম্মত। কোবচের ভিতর যে দাওয়াই আছে গোংগাজলে বাটিয়ে লিয়ে খাইয়ে লিবি—আউর ভগওয়ানকা স্মরণ লিয়ে এক মনে ধেয়ান করবি।

অর্পণা। কুচ্ছু ডর করবি না। হামরা ছোট জাত আছে—লেকিন বিশ্‌ওয়াস করবি। চোল্‌রে শামলা! বহুৎ বেলা হইয়ে গেলো।

হিম্মত। হাঁ হাঁ, বহুৎ দের হইয়ে গেলো। চোল্‌ ঠুংরী!

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

সত্যবতী। কবচের দাম নিয়ে যাবে না?

হিম্মত। আরে বেটি! কোল দেখিয়ে দাম দিবি তো? আগে কোল দেখ্‌না—পোরে একদিন আসিয়ে দাম লিয়ে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

সত্যবতী। আবার আসবে?

হিম্মত। হাঁ—হাঁ, ফিন্‌ আসবে—ফিন্‌ তুহার সহিত দেখা কোর্‌বে। সেদিন যেন এই ছোটজাতকে ভুলিয়ে যাস নে রাজার বেটি!

[হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

সত্যবতী। ভগবান! বেদের দেওয়া এই কবচ যেন সত্য হয়। সত্যই যেন আমাদের সমস্ত বিপদ কেটে যায়। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। দিদি—দিদি! শীগ্‌গীর আয়—সাপের খেলা দেখবি তো আয়। একটা বেদে সাপ খেলা দেখাবে। বড়দা তাদের ধরে রেখেছে।

সত্যবতী। ধরে রেখেছে? সর্ব্বনাশ! তাহ'লে কি বড়দা ওদের—

রাজারাম। কখন রাজবাড়ীতে ঢুকেছিল—কেউ তা জানে না। এখন বেরিয়ে যাবার সময় দাদা তাদের আটকে ফেলেছে।

সত্যবতী। না না, আটকাবে কেন? ওরা খুব ভাল লোক। আমিই ওদের ডেকে এনেছিলাম।

জগতরামের প্রবেশ।

জগত। ভুল করেছিস বোন। এখন যুদ্ধের সময় কে কখন ছদ্মবেশে প্রাসাদে ঢুকবে—আর ঘরের কথা শত্রুকে জানিয়ে দেবে। এখন কি যাকে তাকে—

সত্যবতী। ওরা বেদে,—গুপ্তচর হতে যাবে কেন দাদা?

জগত। কিছু বলা যায় না। সেদিন ভিখারীর ছদ্মবেশে সুভাসিংহের ভাই এসেছিল—দূতবেশে সুভাসিংহ নিজে এসে আমাদের চোখ রাঙিয়ে গেল—এ কথা তো তুই জানিস্?

সত্যবতী। তাই বলে এরাও যে সুভাসিংহের চর,—তা তুমি কি করে বুঝলে?

রাজারাম। ধেৎ! তোরা শুধু ঝগড়া করবি—না সাপ খেলা দেখবি? আয় না দিদি!

জগত। আর যেতে হবে না। আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি।

রাজারাম। ছেড়ে দিয়েছ?

জগত। হ্যাঁ রাজারাম। খেলা দেখার সময় এখন নয়। সাপ আসছে ছোবল মারতে। এখন কি করে তার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া যায়—তাই আমাদের ভাবতে হবে।

রাজারাম। তার জন্য তো আমরা তৈরীই আছি। আসুক না সুভাসিংহ, তরবারি নিয়ে আমিও তার সামনে গিয়ে বলব—খবরদার দেশদ্রোহি! এগিয়ে এস না, দেখছ না আমার হাতে তরবারি?

জবর খাঁর প্রবেশ।

জবর। শুধু বললেই হবে না। সেই তরবারিখানা দুষমনের বুকে বসিয়ে দিতে হবে রাজকুমার!

জগত। আসুন—আসুন নবাবজাদা! খবর সব ভাল তো?

জবর। হ্যাঁ—ভালই।

জগত। তারপর হঠাৎ অসময়ে গরীবের বাড়ীতে?

জবর। বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধু আসবে—তার আবার সময় বিচার কেন?

জগত। তাতো বটেই—তাতো বটেই।

সত্যবতী। আয় রাজারাম! আমরা এখান থেকে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

জগত। আরে দাঁড়া—দাঁড়া! এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। [জবর] এই আমার বোন—সত্যবতী! [সত্যবতীকে] আর ইনি হলেন বাংলার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁর বড় ছেলে নবাবজাদা জবর খাঁ।

সত্যবতী। নমস্কার!

জবর। আদাব—আদাব বহিন।

জগত। [সত্যবতীকে] যা—ভেতরে গিয়ে বাবাকে খবর দে।

জবর। শুধু খবর দিলে চল্‌বে না বহিন? খবরের সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশও আনতে হবে।

সত্যবতী। খবরটা বেশ জবর বলতে হবে।

জবর। জবর খাঁর খবর 'জবর' না হয়ে যেতে পারে।

জগত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সত্যবতী। তা'হলে শুধু সন্দেশ নয়—আমাদের বাড়ীতে আপনাকে আজ ভাত খেয়ে যেতে হবে।

জবর। ইস্! তাহলে তো আরও ভাল। ওতে আমার বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই।

সত্যবতী। হিন্দুর বাড়ীতে খেলে আপনার জাত যাবে না তো?

জবর। জাতটা আমার বাবার যাবে—আমার যাবে না।

জগত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সত্যবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[রাজারাম সহ সত্যবতীর প্রস্থান।

জগত। তারপর কি খবর বলুন?

জবর। মোগল সম্রাটের আদেশ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন?

জগত। হ্যাঁ। দূত ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয়—শুভাসিংহ দিল্লী ও বাংলার আদেশ উপেক্ষা করে বর্দ্ধমান আক্রমণ করবে!

জবর। ঠিক তাই। বাংলার শাসনকর্ত্তা এই বিদ্রোহ দমন করতে কতটা সাহায্য করবেন—তার প্রমাণ তো সেই দিনই পেয়েছেন। তাই আমি নিজে এসেছি ব্যক্তিগত ভাবে যতটা পারি আপনাদের এই বিপদে—

জগত। কিন্তু আপনার বাবার অমতে—

জবর। উপায় কি? দিল্লীর আদেশে যদি আমাকে আব্বার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়—দাঁড়াব।

জগত। তাতে যদি নবাব পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়?

জবর। কয়েকজন গাজী হাজীকে দিয়ে গোলেস্তা পাঠ করে নিলেই আবার শান্তি ফিরে আসবে।

জগত। সে শান্তি কি সুখের হবে নবাবজাদা?

জবর। এ দুঃখের চেয়ে অনেক সুখের হবে। আর তাও যদি না হয়, তা'হলে আবার দুঃখ বরণ করব। তবু আব্বার নিস্ক্রিয় অলসতা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। রাজ্যে শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই, সৈন্যরা হাতিয়ার ধরতে ভুলে গেছে। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী —এমন কি ফৌজদার মনসবদার পর্য্যন্ত সুরা আর বাঈজী নিয়ে মত্ত। এর নাম কি রাজত্ব? এরা কি মানুষ? এই কি আমাদের জীবন?

সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। রাজকুমার! গুপ্তচরের সংবাদ—

জগত। সংবাদ?

সৌবীর্য্য। সুভাসিংহ দলবল নিয়ে বর্দ্ধমান রওনা হয়েছে।

জগত। পাঠানদস্যু রহিম খাঁ?

সৌবীর্য্য। দস্যুবাহিনী নিয়ে সেও সুভাসিংহের সঙ্গে আসছে।

জগত। নবাবজাদা!

জবর। দুঃসংবাদ! আমি এখনই ফিরে যাচ্ছি ভাই! দিল্লীর আদেশ—বাংলার হুকুম অগ্রাহ্য করে সুভাসিংহ যখন স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে—বাংলার শাসনকর্ত্তা ঘুমিয়ে থাকলেও নবাবজাদা জবর খাঁ ঘুমিয়ে নেই। ঘুমিয়ে নেই যশোরের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ, মোগল রাজকর্ম্মচারী নেয়ামত খাঁ। তারাই এই বিদ্রোহকে দমন করবে। সুভাসিংহ ও রহিম খাঁকে শায়েস্তা করে বাংলার এই দেশদ্রোহিতার উপযুক্ত মূল্য আদায় করবে। [প্রস্থানোদ্যত]

জগত। আবার কবে—কখন দেখা পাব নবাবজাদা!

জবর। বিপদের চরম লগ্নে—অস্ত্র হাতে আমার হিন্দুভাই জগত রামের পাশে। [পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

জগত। নবাবজাদা—

জবর। বহিনের সঙ্গে দেখা হলো না। তাকে বলবেন—খোদা যদি সুদিন দেন, তাহলে সত্যিই একদিন তার এই মুসলমান ভাই হিন্দু বহিনের হাতের ভাত খেয়ে জীবনকে ধন্য করবে। আদাব—আদাব!

[কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান।

জগত। সেনাপতি মশায়! আর মুহূর্ত্ত দেরী নয়। বিদ্রোহী সেনাদল যাতে বর্দ্ধমানের সীমানার মধ্যে ঢুকতে না পারে, এখনই তার ব্যবস্থা করুন।

সৌবীর্য্য। সবই ঠিক আছে কুমার! এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা।

জগত। আদেশ দিচ্ছি। তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানের সৈন্যকে তৈরী হতে বলুন। দস্যু আসছে। বেইমান বাঙালী হিন্দু আর আফগান-কুল-কলঙ্ক পাঠান দুই কলঙ্কিত রক্তস্রোত একই নর্দ্দমার পাঁকে মিশে গেছে। সাবধান সেনাপতি! বর্দ্ধমানের পবিত্র গায়ে সে কলঙ্কিত কাদা যেন একটুও না লাগে। [প্রস্থানোদ্যত]

সৌবীর্য্য। কে আছ! তোরণ শীর্ষ থেকে তূর্য্যধ্বনি কর। ডাকাত আসছে—বাংলার ডাকাত শয়তান সুভাসিংহ।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

জগত। হতভাগ্য বাংলা! কেঁদো না,—চোখের জল ফেলো না। শুধু চোখ মেলে চেয়ে দেখ—তোমার বুকের মাটি আজ কার রক্তে ভিজে যায়।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান সীমান্ত পথ।

চূড়াধর ও বোঁচকা মাথায় চাকরবেশী বিকলাঙ্গ রহিমখাঁর প্রবেশ।

চূড়াধর। আয়-আয় ব্যাটা! একটু তাড়াতাড়ি আয়। মহা বিপদে পড়েছি তোকে সঙ্গে নিয়ে।

রহিম। কেন দাঠাকুর! আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। যখন যা বলতেছ—তেক্ষুনি তাই করতিছি।

চূড়াধর। [মুখ ভ্যাঙাইয়া] তাই করতিছি। ব্যাটা হাঁদারাম। বোঁচকা বুঁচ্‌কিগুলো একটু ভাল করে নে। পড়ে যাবে যে। ওর মধ্যে কাসুন্দির পোঁট্‌লা—চাল ডাল, গুড়ুক তামাক—

রহিম। তামুক? হেঃ-হেঃ-হেঃ তা দাঠাকুর! এইখেনে একটু বসে এক ছিলিম তামুক খেয়ে নিলি, হতো না?

চূড়াধর। ওরে ব্যাটা! এটা হলো বর্দ্ধমানে ঢোক্‌বার চওড়া রাস্তা। এখানে বসে জিরুই—আর কোন্ ফাঁকে শালা রহিম খাঁ এসে সব লুটে পুটে নিয়ে যাক্!

রহিম। তুমি ক্ষেপেছ দাঠাকুর! ঐ দেখ—বর্দ্ধমানের সৈন্যরা শিবির গেড়ে বসে আছে। এখেনে শালা রহিম খাঁ আসবে কেমন করে?

চূড়াধর। ও শালা সব পারে। গাঁ ছেড়ে যেদিন বেরিয়েছি সেদিন থেকে শালা যেন পক্ষিরাজ। এই দেখ ওপাড়ার মোড়ল

বাড়ী ডাকাতি করছে, আবার হুম্ করে উড়ে এসে একেবারে আমাদের সামনে হাজির।

রহিম। ওরে বাবারে! তাই নাকি? তাহলি তো শালা এখেনেও মাটি ফুঁড়ে গজাতি পারে?

চূড়াধর। খুব পারে। ওরা যে ডাকাত।

রহিম। ভাগ্যিস তোমাদের পথের মাঝখানে পেইলাম—তা না হলি ডাকাতের হাতেই প্রাণডা যেত আর কি!

চূড়াধর। কিন্তু তুই তো ব্যাটা বুড়ো ঢেঁকি—মোট মাথায় নিয়ে নড়তেও পারিস নে—হাঁটতেও পারিস নে।

রহিম। এটু ক্ষেমা-ঘেন্না করে চালিয়ে নেও দাঠাকুর। বুড়ো মানুষ—তার ওপর বর্দ্ধমানের পথ-ঘাটও চিনিনে। কোথায় যাতি কোথায় পড়ব—আর গপ্ করে শালা রহিম খাঁ এসে [কান্নার সুরে] দে—বে—আমা—রে শেষ করে।

চূড়াধর। এই-এই ব্যাটা! থাম্-থাম্! এই রাস্তার মাঝখানে কান্নাকাটি করলে তুই তো যাবিই, শেষকালে আমাকেও আর ফিরে যেতে হবে না। যার ভয়ে গাঁ ছেড়ে এই বর্দ্ধমানে পালিয়ে এলাম, সেই রহিম খাঁ—

রহিম। [আরও উচ্চকণ্ঠে কান্নারসুরে] ও চা-চা—রহিম খাঁ!

চূড়াধর। মাটি করেছে। ব্যাটা সর্ব্বনাশ করলে দেখ্ছি! এই—এই হারামজাদা! ওরে থাম্—থাম্!

[ছুটাছুটি করিতে করিতে চূড়াধর যতই রহিম খাঁকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—রহিম খাঁ ততই কান্নার সুর উচ্চ পর্দ্দায় চড়াইয়া বলিতে লাগিল।]

রহিম। ও! আমার রহিম চাচা গো তুমি কোথায় গো—

চূড়াধর। গেল—গেল! ডাকাতের হাতেই প্রাণটা গেল রে! ওরে ব্যাটা বুড়ো ঢেঁকি! তোর পায়ে পড়ি একটু চুপ কর্! গুয়ে ব্যাটাও আবার এ সময় পেছিয়ে পড়ল! [উচ্চৈস্বরে ডাকিতে ডাকিতে] ওরে ব্যাটা গুয়ে। গুয়ে রে!

নেপথ্যে গুয়ে। কি গো মামা।

চূড়াধর। শীগ্‌গীর আয়! বুড়ো ঢেঁকির কাণ্ডখানা দেখে যা!

গাঁজার কলকেয় দম দিতে দিতে গুয়ের প্রবেশ।

গুয়ে। [একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া] বোম শঙ্কর! কি হলো মামা। এত চেঁচামেচি করছ কেন?

চূড়াধর। শীগ্‌গীর আয়—শীগ্‌গীর আয়।

গুয়ে। কেন মামা! কি হলো?

চূড়াধর। তুই তো ব্যাটা রাস্তার মাঝখান থেকে এই খোঁড়া পীর জোটালি—এখন যে বেঘরে প্রাণটা যায়।

গুয়ে। কেন—কেন?

চূড়াধর। কোথাও কিচ্ছু না—হঠাৎ ব্যাটা "রহিম চাচা-রহিম চাচা" বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লেগেছে।

গুয়ে। তাই নাকি? বাবা বুড়ো শিব! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ? দেখতে তো ন্যাকা বোকা। তুমি বাবা রহিম চাচার গুপ্ত সাকরেদ নও তো?

রহিম। না গো কত্তা না। আমার এক মামাতো ভাই—তার নাম ছেল মহিম সা হঠাৎ একদিন ওলা-ওঠা রোগে ভাইডা আমার মরে গেল। পথে আসতি আসতি তার সেই মরা মুখখানা

যতই মনে পড়তেছে—ততই অমনি বুকির মদ্দি আমার হু-হু করে উঠতেছে। তাই মনের ভুলি কাঁদতি কাঁদতি 'মহিম' না বলে—[কান্নার সুরে] রহিম—চা—চা—বলে—ফে—লে—ছি।

চূড়াধর। [সেই সুরে সুর মিলাইয়া] রহিম—চা—চা—বলে ফেলেছি। আঁটকুড়ীর ব্যাটা! এই বিপদের সময় ভগবানের নাম না ঢুকে তোমার বুকের মধ্যে রহিম চাচার নাম ঢুকেছে?

রহিম। শুধু বুকির মদ্দি ঢুকেছে? এই এখানে দাঁড়িয়ে রইছি—মনে হচ্ছে পার তলায় রহিম চাচা, মগজের মদ্দি রহিম চাচা, চোখের সামনে রহিম চাচা, যেদিকি তাকাচ্ছি সব দিকেই যেন র-হি-ম—চা-চা-র ছবি!

চূড়াধর। মরেছে—ব্যাটা নির্ঘাৎ মরেছে। ও গুয়ে!

গুয়ে। মামা!

চূড়াধর। ব্যাটাকে ভূতে পেল নাকি? যেদিকে তাকাচ্ছে—সেই দিকেই নাকি রহিম চাচা!

রহিম। হ্যাঁ গো কর্ত্তা! নীচে-ওপরে ডাইনি-বাঁয় সাম্‌নে—পেছনে—ওরে বাবারে! ঘিরে ধরেছে।

গুয়ে। ঘিরে ধরেছে?

রহিম। হাঁ্যা কর্ত্তা! চারিদিকেতে ঘিরে ধরেছে। এসে পড়ল! ধরে ফেলল! শীগ্‌গীর চোখ বুজোও! রহিম চা—চা—রহিম-চাচা!

চূড়াধর। ও—গু—য়ে—[ভয়ে ছুটিয়া গিয়া গুয়েকে জড়াইয়া ধরিল]

গুয়ে। মামা! চোখ বুজোও—[গুয়ে চূড়াধরকে জড়াইয়া ধরিল এবং উভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল]

রহিম। হাঁ হাঁ, চোখ বুজিয়ে থাক! ডাকাত আসছে! মহাত্রাস রহিম খাঁ! খবরদার—চোখ খুললে গপ্‌ করে ধরে ফেলবে।

[এই অবসরে রহিম খাঁ তাহার চাকরের বেশ—সাদা গোঁফ
দাড়ি পোষাক ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিল এবং বিকট
মূর্ত্তিতে ডাকাতের পূর্ণ বেশে তাহাদের সামনে
দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।]

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চূড়াধর। [চক্ষু খুলিয়া] ওরে বাবারে! ও গুয়ে! এ আবার কে?

রহিম। পাঠানদস্যু রহিম খাঁ! আর কারও নিস্তার নেই, সবাইকে আমি কোতল করব। আয়—চলে আয়।

চূড়াধর। কোথায় যেতে হবে বাবা?

রহিম। আমাদের সঙ্গে হাতিয়ার ধরে বর্দ্ধমান-সৈন্যের সাথে লড়াই করতে হবে।

গুয়ে। কিন্তু আমরা যে হাতিয়ার ধরতে জানি নে।

রহিম। কোন কথা শুনব না। এ ক'দিন তোদের মোট মাথায় নিয়ে চাকর সেজে তোদের সঙ্গে এসেছি। পথ ঘাট সব চিনে নিয়েছি। এইবার আমার চাকর সেজে তোদের আসতে হবে আমার পিছনে পিছনে। নে—তোল মাথায় পোঁটলা।

চূড়াধর। ও বাবা! একি হলো? দুধকলা দিয়ে এ কদিন কালসাপ সঙ্গে রেখেছি? ও গুয়ে!—

গুয়ে। আর কি হবে মামা! যে কর্ম্মের যে ফল! তোল মাথায়। [গুয়ের সাহায্যে চূড়াধর মোট মাথায় তুলিল]

রহিম। আয়—চলে আয়। খবরদার! চেঁচামেচি করলে এই-খানেই দুটোকে শেষ করে দেব। [প্রস্থানোদ্যত]

চূড়াধর। আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে বাবা?

রহিম। বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে। পেছনে আমার দলবল রয়েছে,

তাদের পথ দেখিয়ে আনতে হবে। বাংলার বিদ্রোহ—মোগলের বিরুদ্ধে পাঠান-বাঙালীর সম্মিলিত জেহাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। চালাও—খতম করে দাও, বিদেশীর অনুগ্রহে যারা আজ মোগলের জুতি মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের আমি—

বেদিনীর বেশে সাপের ঝাঁপি মাথায় অর্পণার প্রবেশ।

[অর্পণা রহিম খাঁর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল ও মাথার উপর অবস্থিত ঝাঁপি হইতে একটি কৃত্রিম সাপের অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া রহিম খাঁকে ভয় দেখাইতে লাগিল এবং হাসিমুখে বলিতে লাগিল]

অর্পণা। ফোঁস্! সাপের খেলা দেখবে বাবু! সাপের খেলা?

[রহিম খাঁ ভয়ে এদিক ওদিক করিতে করিতে যেমন পলায়ন করিতে যাইবে,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল পথের মাঝখানে অনুরূপ সাপ হাতে বেদে বেশে হিম্মত দাঁড়াইয়া হাসিতেছে]

কৃত্রিম সাপ হাতে হিম্মত সিংহের প্রবেশ।

হিম্মত। ফোঁস্! সাপের খেলা দেখবে বাবু—সাপের খেলা?

[সামনে হিম্মত, পশ্চাতে অর্পণা—উভয়ের হাতে কৃত্রিম সাপ—মাঝখানে রহিম খাঁ উভয় সঙ্কটে পড়িল। চূড়াধর ও গুয়ে অর্পণার ইঙ্গিতে সেখান হইতে রহিমের পরিত্যক্ত বোঁচকা দাড়ি-গোঁফ চুল প্রভৃতি কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

অর্পণা। বহুৎ বোড়ো সাপ আছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রহিম। তবে রে শয়তানের বাচ্চা! পাঠানদস্যু রহিম খাঁকে সাপের ভয় দেখাবি? এই দেখ—তোদের আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছি!

[হাতিয়ার লইয়া উভয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে হিম্মত ও অর্পণা একসঙ্গে গুপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল]

উভয়ে। ফোঁস—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হিম্মত। ওরে ঠুংরি! এত্তোবোড়ো ডাকাত আজ বেদের হাতে ধোরা পোড়িয়ে গেলো। ডাক্—ডাক্—রাজার বেটাকে ডাকিয়ে দে! বরধমান আড্ডায় খোবর দিয়ে দে—শালাকে বাঁধিয়ে লিয়ে যাক্।

অর্পণা। [উচ্চ চীৎকারে] হো রাজার বেটা! আরে জলদি আয়—ডাকাত ধোরা পড়িয়েছে—ডাকাত ধোরা পড়িয়েছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

রহিম। দাঁড়াও! [হিম্মতকে] ছোটরাজা!

হিম্মত। ছোটরাজা? হাঃ-হাঃ-হাঃ তাহলে চিনতে পেরেছ খাঁ সাহেব?

রহিম। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি সেইদিন—যেদিন তোমরা ছলনায় ভুলিয়ে আমার হাত থেকে সেই হিন্দু আওরাতকে কেড়ে নিয়েছিলে। কিন্তু মনে রেখো ছোটরাজা! শত চেষ্টা করলেও তোমরা আমাদের অভিযান বন্ধ করতে পারবে না।

হিম্মত। বন্ধ করতে না পারি—পায়ে পায়ে বাধা দেব। সত্যের গণ্ডী দিয়ে তোমাদের এই মিথ্যার অভিযানকে আটকাতে পারব।

রহিম। সত্য! হাঃ-হাঃ-হাঃ—কোথায় সত্য? কিসের সত্য? সত্য আজ মাটির তলায় কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। দিল্লীর দিকে চেয়ে দেখ সত্যের কবরের বুকে ঔরঙ্গজীবের ময়ূর সিংহাসন কেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বাংলার ইতিহাস খুলে দেখ শেষ পাঠান-নবাব দায়ুদ খাঁর সত্যকে অত্যাচারী মোগল কেমন করে মাটি চাপা দিয়েছে। সাজাহান কোথায়? কোথায় আজ দায়ুদ খাঁ? কোথায় গেল তাদের সত্যের জেহাদ?

হিম্মত। সেই সত্যের জেহাদকে সম্পূর্ণ করতেই কি তোমাদের এই ডাকাতির অভিযান?

রহিম। যদি বলি তাই? এবং এ অভিযানের নায়ক তোমারই দাদা।

হিম্মত। সে তোমার সাহায্যে—তোমারই উৎসাহে। শুধু তুমি ফিরে এস রহিম খাঁ! দেখবে দাদার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেছে।

রহিম। আর তা হয় না ছোটরাজা! বর্দ্ধমানের মধ্যে এসে পড়েছি—ফেরবার আর উপায় নেই।

অর্পণা। তাহলে বর্দ্ধমান সৈন্যের হাতে তোমাকে ধরিয়ে দেব দস্যু!

রহিম। তাতে আমার চেয়ে তোমাদেরই ক্ষতি হবে বেশী।

হিম্মত। যত ক্ষতি হোক্—বুক পেতে তা সহ্য করব।

রহিম। বুকখানা ছিঁড়ে যাবে ছোটরাজা!

হিম্মত। বাঙালী হিন্দুকে তুমি চেন না দস্যুসর্দ্দার! এরা যেমন বাজের আঘাতকে সহ্য করবার হিম্মত রাখে, তেমনি আবার ফুলকে আঘাত করে কাঁদতেও জানে। এখনো সময় আছে, এখনো ফিরে এস রহিম খাঁ! উড়িষ্যার ঘরে ঘরে আগুন জেলেছ—বাংলার হাটে-মাঠে লুটপাটের ঝড় তুলেছ,—আবার বর্দ্ধমানের শান্তির ঘরে হাহাকার সৃষ্টি করে তাকেও আর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।

রহিম। ছোটরাজা!

হিম্মত। চোখ মেলে চেয়ে দেখ পাঠান দস্যু! তোমাদের অত্যাচারে হুগলীর পথে পথে আজ সর্ব্বহারার আর্ত্তনাদ, লুটের ভয়ে ঘরের মানুষ তার সর্ব্বস্ব নিয়ে আঁকড়ে বসে আছে। নারী পারছে না তার ইজ্জৎ রাখতে, শিশুর চোখে ঘুম নেই, মানুষের মনে শান্তি নেই, লুটের জ্বালায় সবাই আজ সন্ত্রস্ত। রহিম খাঁ! কেন এমনি

করে বাংলার অভিশাপ কুড়িয়ে নিচ্ছ? কেন বাংলার ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে এমনি করে ছিনিমিনি খেলছ?

রহিম। ছোটরাজা!

হিম্মত। তুমিও তো মানুষ! বাঙালীর রক্তধারাকে তুমি তো চেন রহিম খাঁ! বিদেশীর অত্যাচারে—দানবের পদাঘাতে এরা বার বার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তবু এদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়নি। ধ্বংসের ভস্মস্তূপে কতবার এরা হারিয়ে গেছে,—তবু এদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় নি। এদের ক্ষেপিয়ে তুলো না রহিম খাঁ! সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে বাঙালীর হাতে বাংলার মাটিতেই হবে তোমার জীবন্ত কবর।

রহিম। বাঙালীর হাতেই যদি আমার কবর হয়, তাহলে তার আগে তোমার হাতেই তুলে দেব বাঙালী আমাদের এই বিদ্রোহের নিশান।

হিম্মত। এ নিশান সুভাসিংহের হাতেই মানাবে রহিম খাঁ—আমার হাতে নয়।

রহিম। আমার জীবনের খোয়াবকে তুমি সফল কর ছোটরাজা!

হিম্মত। তোমারও একটা জন্মকে তুমি বাংলা মায়ের পায়ে অঞ্জলি দাও রহিম খাঁ! জন্মের পাপে একটা মানুষ আজ নরকের পথে এগিয়ে যাচ্ছে—তুমি তাকে ফেরাও, মুছিয়ে দাও তার জন্মের কলঙ্ক, ঘুচিয়ে দাও তার লুটের নেশা। নরকের জঘন্য কদর্য্যতা থেকে টেনে এনে তুমি তাকে মানুষ কর রহিম খাঁ!

রহিম। আমি?

অর্পণা। হ্যাঁ তুমি। তুমিই পার আমার দাদাকে ফিরিয়ে আনতে।

হিম্মত। তুমিই পার দাদার কলঙ্কিত জীবনে সত্যের জোয়ার আনতে।

রহিম। না—না, আমি পারব না—পারব না ছোটরাজা।

অর্পণা। রহিম খাঁ! তোমার মনুষ্যত্বের কাছে আমরা দুটি ভাইবোন আজ যুক্ত করে দাঁড়িয়েছি—বল দস্যু! তুমি জাগবে কি না? ডাকাতের জন্ম থেকে ফিরে এসে তোমার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করবে কি না?

হিম্মত। জীবনে তুমি যত পাপ করেছ, জীবনের খাতায় যতখানি কলঙ্কের কালি ঢেলেছ, বল ডাকাত! তোমার অনুতাপের অশ্রুজলে তুমি তা মুছিয়ে দেবে কি না? বল—নইলে এই জনহীন পথের মাঝখানে এই ছুরি দিয়ে হয় তোমাকে শেষ করে দেব, আর না হয় তোমাকে ডাকাতের জন্ম থেকে ফিরিয়ে আনব মানুষের মাঝখানে, গড়ে তুলব তোমাকে সত্যিকারের একটা মানুষ রূপে।

রহিম। ছোটরাজা!

হিম্মত। বল, কি চাও? মৃত্যু—না নূতন জীবন?

অর্পণা। বেহেস্ত—না দোজাক?

হিম্মত। বল—উত্তর দাও। উত্তর দাও দস্যু!—

[উভয়ের উপর্য্যুপরি প্রশ্নবাণে রহিম খাঁ বিচলিত হইয়া উঠিল]

রহিম। না না, আমি মৃত্যু চাই না। আমি চাই জীবন—কলঙ্কময় ডাকাতির জীবন। আমি চাই বাংলা দেশটাকে ভূমিকম্পের মত নাড়া দিতে। আমি চাই ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে পাঠান-রক্তের প্রতিশোধ নিতে। [প্রস্থানোদ্যত]

হিম্মত। ডাকাত!

রহিম। ছোটরাজা! বহিন! আর আমার বিবেকের গায়ে চাবুক মের না। আমি ডাকাতি ভুলে যাব—ভুলে যাব আমার রক্তের নেশা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[পুনরায় প্রস্থানোদ্যত]

তরবারি হাতে জগতরামের প্রবেশ।

জগত। তোমার রক্তের নেশা আজ ঘুচিয়ে দেব শয়তান।

রহিম। কে তুই বেতমিজ ?

জগত। আমি তোর যম।

[উভয়ের যুদ্ধ]

হিম্মত। শেষ করিয়ে দে—ডাকাইতকে শেষ করিয়ে দে। হামরা তুঁহার দোলবলকে খোবর দিতে যাচ্ছে।

[হিম্মত ও অর্পণার প্রস্থান। পরে যুদ্ধ করিতে করিতে জগতরাম ও রহিম খাঁর প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ।

[নেপথ্যে রণবাদ্য ও তূর্য্যধ্বনি। পরপর দুই তিনটি বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।]

মুক্ত তরবারি হাতে সুভাসিংহের প্রবেশ।

সুভাসিংহ। চালাও—চালাও গুলি! নারী শিশু কাউকে বাদ দিও না। মানুষের তাজা রক্তে রাজবাড়ীটা রাঙিয়ে দাও। ঘেরাও কর—রাজভাণ্ডার লুট কর। চালাও—চালাও গুলি!

তরবারি হাতে কৃষ্ণরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণরাম। না না, গুলি চালিও না। সুভাসিংহ! যত অত্যাচার

করতে হয় আমাদের উপর কর। কিন্তু নারী আর শিশুকে হত্যা করে তোমার ধ্বংস-যজ্ঞের আগুন আরও জ্বালিয়ে তুলো না।

সুভাসিংহ। ধ্বংসযজ্ঞ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—এ আর কতটুকু? রাজাকৃষ্ণরাম রায়! তোমার প্রাসাদ আমরা ঘিরে ফেলেছি। একটা মানুষও আর বাইরে আসতে পারবে না। এইবার সুরু হবে আমার খেলা।

কৃষ্ণরাম। সুভাসিংহ! এখনও ক্ষান্ত হও!

সুভাসিংহ। রাজকন্যাকে আমার হাতে তুলে দাও।

কৃষ্ণরাম। জীবন থাকতে নয়।

সুভাসিংহ। জোর করে কেড়ে নেব।

কৃষ্ণরাম। মনে রেখ সুভাসিংহ! এটা তোমার জমিদারী নয়।

সুভাসিংহ। বর্দ্ধমানের মাটিও তুমি পাঞ্জাব থেকে তুলে আননি।

কৃষ্ণরাম। তবু এই মাটিতেই আমার জন্ম। মনে করো না শয়তান, তোমার এই অত্যাচার বৃথাই যাবে। বাংলার বুকে যে কলঙ্কের দাগ তুমি দিলে, শত শত বর্ষ পরেও তা কোনদিন মুছে যাবে না। যে নারীর জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠেছ—সেই নারীর হাতেই হবে তোমার নৃশংস মৃত্যু।

সুভাসিংহ। কিন্তু দুঃখের কথা—মহারাজ সে মৃত্যুটা দেখে যেতে পারবেন না। কারণ তার আগেই মহারাজকে দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে।

কৃষ্ণরাম। বিদ্রোহী! সাবধান! মহাকালের ঘণ্টা বেজেছে। তাকে উপেক্ষা করো না! এখনও সময় আছে।

সুভাসিংহ। মহাকালকে সুভাসিংহ ভয় করে না। বাংলার মাটিতে সে যতক্ষণ আছে, মহাকাল তাকে দেখলে সেলাম ঠুকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কৃষ্ণরাম। এ গর্ব্ব তোমার থাকবে না সুভাসিংহ।

সুভাসিংহ। না থাকে, তখন মাথাটা কেটে নিও।

কৃষ্ণরাম। মাথা নিলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। বেঁচে থেকেই তোমাকে জবাব দিহি করতে হবে।

সুভাসিংহ। কার কাছে?

কৃষ্ণরাম। বাংলার কাছে—বাঙালীর কাছে। বর্দ্ধমান-রাজবংশের চিহ্ন তুমি মুছে ফেলতে পার, কিন্তু তোমার অত্যাচারের কথা কোনদিন বাঙালী ভুলতে পারবে না। বাংলার পথের ধূলোয় লেখা থাকবে তোমার কলঙ্ক কাহিনী—দামোদরের তরঙ্গ দোলায় ভেসে বেড়াবে তোমার পাপের কীর্ত্তি, দেখবে তাই হাজার হাজার মানুষ। তারা হাসবে-ধিক্কার দেবে, অবজ্ঞার থুথু ফেলবে তোমার মুখে।

সুভাসিংহ। ফেলুক। বাংলার মানুষ আমাকে দেশদ্রোহী বলেই জেনে রাখুক, তবু বর্দ্ধমান-রাজবংশের আভিজাত্যকে আমি আর মাথা চাড়া দিতে দেব না।

কৃষ্ণরাম। তবে এস হিন্দুর কলঙ্ক! তোমার বুকের রক্তে আমার সেই আভিজাত্যের চূড়াকে আরও রাঙিয়ে তুলি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

হিম্মত ও রহিম খাঁর প্রবেশ।

হিম্মত। কথা রাখবে না রহিম খাঁ?

রহিম। বলেছি তো রাজকন্যার গায়ে হাত দেব না! আমি চাই ধনরত্ন।

হিম্মত। এখনও সময় আছে—এখনও দাদাকে ফেরাও। যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিয়ে এই সর্ব্বনাশা সংগ্রাম বন্ধ কর।

রহিম। উপায় নেই। বরং তোমরা ফিরে যাও—নইলে মরবে।

হিম্মত। মরার ভয় বাঙালী করে না।

রহিম। তেমন বাঙালী কোথায়? সারা বাংলা আমি চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন একটা মানুষ দেখলাম না—যে আমার পয়জার খেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

হিম্মত। এইবার দেখতে পাবে।

রহিম। সে হিম্মত থাকলে চেতোয়ার ছোটরাজা হিম্মত সিংকে আজ—ঐ তোমার দাদা আসছে।

হিম্মত। দাদা!

রহিম। হ্যাঁ! সরে যাও রামভক্ত লক্ষণ! ধরা পড়লে এ আগুন আরও জ্বলে উঠ্‌বে।

হিম্মত। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে এই শেষবার বলে যাচ্ছি রহিম খাঁ! কথা যখন শুনলে না—তখন তার ফল ভোগ করতেই হবে। যুদ্ধে তোমার নাক কাটা গেছে,—এইবার তোমার নাক-কান দুটোই কেটে নিয়ে হয় তোমাকে বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়ে দেব, আর না হয় তোমার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে দিল্লীর দরবারে পাঠিয়ে দেব!

[প্রস্থান।

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পাঠানসর্দ্দার রহিম খাঁকে বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়ে দেবে হিন্দু? হাঃ-হাঃ-হাঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

শশব্যস্তে সুভাসিংহের পুনঃ প্রবেশ।

সুভাসিংহ। এই যে খাঁ সাহেব! যুদ্ধের খবর কি?

রহিম। আমি তো এইমাত্র এসে পৌছলাম।

সুভাসিংহ। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

রহিম। আটক পড়েছিলাম।

সুভাসিংহ। কার এত সাহস যে ডাকাত রহিম খাঁকে আট্‌কে রেখেছিল?

রহিম। আলেয়া।

সুভাসিংহ। আলেয়া? সেকি!

রহিম। পরে বলব? এখন যুদ্ধের খবর কি তাই বল।

সুভাসিংহ। রাজা পালিয়েছে।

রহিম। পালিয়েছে?

সুভাসিংহ। হ্যাঁ। একবার মুখোমুখি আমার সঙ্গে জোর লড়াই হয়েছে। ফাঁক বুঝে যেমন বন্দী করতে যাব, অমনি চোখের নিমেষে পালিয়ে গেল।

রহিম। রাজবাড়ী ঘেরাও করেছ?

সুভাসিংহ। বেড়া দিয়ে ফেলেছি। একটা পিঁপ্‌ড়ে পর্য্যন্ত বাইরে আসতে পারবে না।

রহিম। বহুৎ আচ্ছা! আমার হাতেও রাজার ছেলেটা জখম হয়ে পালিয়েছে। দোস্ত! রাজাকে খোঁজ—বন্দী কর—তারপর চলবে লুটপাট।

সুভাসিংহ। তাহলে আর দেরী নয়। চল খাঁ সাহেব! এইবার একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

রহিম। হ্যাঁ, চল! হুঁসিয়ার জোয়ানের দল! খুব হুঁসিয়ার! খুন দাও—জান কবুল কর তবু দুষমনের হাতে পাঠানের ইজ্জৎ দিও না।

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। আবার গুলি চালাও। রাজবাড়ীটা কাঁপিয়ে তোল। রাজাকে বন্দী কর। সুভাসিংহের মান সম্ভ্রম তোমাদের হাতে দিয়েছি—খবরদার যেন হটে এস না। রাজাকে ধরা চাই। [প্রস্থানোদ্যত]

জগতরামের প্রবেশ।

জগত। পাবে না। মনে করেছ দস্যু, রাজবাড়ীটা ঘিরে ফেলেছ বলে আমরা তোমাদের কাছে পরাজিত? এখনই দেখতে পাবে বাংলার নবাব-সৈন্য তোমাদেরও ঘিরে ফেলেছে।

সুভাসিংহ। তার আগে তোমাদের হাতে উঠবে লোহার শিকল।

জগৎ। তোমাদেরও পায়ে পড়বে লোহার বেড়ী।

সুভাসিংহ। রাজবাড়ী ধূলিসাৎ করে দেব।

জগত। সেই ধূলোর ওপর তৈরী করব তোমার মরণের চিতা।

সুভাসিংহ। জগতরাম।

জগত। সুভাসিংহ! কেন এ কাজ করলে? তুমি না জমিদার? তুমি না গরীবের মা-বাপ? তোমার হাতেই না রয়েছে নারীর মান-সম্ভ্রমের ভার? এমনি করেই তুমি তা পালন করছো?

সুভাসিংহ। তোমার ভগ্নীকে চাওয়া কি আমার অন্যায়?

জগত। শুধু অন্যায় নয়—পাপ।

সুভাসিংহ। কিসের পাপ? তোমাদের মত আমারও রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, আছে বংশ গৌরব। তোমাদের মত আমিও মানুষ।

জগৎ। মানুষ? কে বলে তুমি মানুষ? জন্ম তোমাকে মানুষ করেছে সুভাসিংহ—কিন্তু কর্ম্ম তোমাকে চিরকাল বাংলার ইতিহাসে লম্পট করেই রেখে দেবে। যেখানে তুমি স্বর্গ তৈরী করতে পারতে, সেই চেতোয়া তোমার ধ্বংস হবে, সেই বর্দ্ধোয়া শ্মশান

হবে, নারীর বুকফাটা কান্নায় সেখানকার মাটি কেঁদে উঠ্‌বে। বাংলার মানুষ তাই শুনবে আর দিনরাত তোমাকে অভিশাপ দেবে।

সুভাসিংহ। সে অভিশাপে তোমরা ভয় করতে পার, কিন্তু সুভাসিংহ ভয় করে না। সে মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। জীবনকে সে রাখে চোখের সামনে, আর মৃত্যুকে রাখে পায়ের তলায়।

জগত। তবে এস শয়তান। আমি তোমাকে সেই মৃত্যুই দেব—যাকে তুমি পায়ের ভৃত্য বলে এতদিন উপেক্ষা করে এসেছ।

[উভয়ের যুদ্ধ। জগতরাম আহত হইয়া পড়িয়া গেল]

সুভাসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—থাক এইখানে। এইবার রাজা কৃষ্ণরাম রায়! তোমাকে বন্দী করব, তারপর তোমারই চোখের ওপর দিয়ে তোমার মেয়েকে নিয়ে যাব চেতোয়ার রাজপ্রাসাদে।　　[প্রস্থান।

জগত। হলো না, আর বুঝি পারলাম না। বর্দ্ধমান রাজবংশের গৌরব সূর্য্য—আঃ—সত্যবতী! রাজারাম! ঘর থেকে কেউ বেরোস নি, শয়তান যাচ্ছে, তোদের মান সম্ভ্রম লুটে নেবে। সত্য!

ছদ্মবেশে কৃষ্ণরামের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণরাম। কে ডাকলে! কে আর্ত্তনাদ করলে? মরণের এই হোলি খেলায় রক্তে রাঙা মাটির বুকে—একি! একি! জগত! তুই আহত?

জগত। বাবা! ছদ্মবেশে কেন? তবে কি আমাদের—

কৃষ্ণরাম। পরাজয়। কিন্তু তুই আর দেরী করিস নে জগত! আমার এই ছদ্মবেশ পরে এখান থেকে পালিয়ে যা।

জগত। না না, তা হয় না বাবা। আহত হলেও এখনও শক্তি আছে। এখনও চেষ্টা করতে—

কৃষ্ণরাম। ওরে হতভাগা! তোকে যে বাঁচতে হবে। বর্দ্ধমানের জ্বলন্ত প্রদীপশিখা, তোকে আমি নিভতে দেব না।

জগত। কিন্তু মেয়েদের উপায়?

কৃষ্ণরাম। মেয়েদের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। একটা একটা করে সবাইকে আমি বলি দেব।

হিম্মতের পুনঃ প্রবেশ।

হিম্মত। না—মেয়েদের ভার আমি নেব।

কৃষ্ণরাম। কে তুমি?

জগত। এই সেই বেদে—যে তীর ধনুক নিয়ে আমাদের অন্দরের গুপ্ত পথে পাহারা দিচ্ছে।

হিম্মত। না—আমি বেদে নই—সুভাসিংহের ভাই।

জগত। ভাই?

কৃষ্ণরাম। সুভাসিংহের ভাই তুমি! তোমার দাদা এসেছে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে—আর তুমি এসেছ আমাদের রক্ষা করতে?

হিম্মত। আজ নয়—বহুদিন থেকে বহুরূপীর বেশে। শুধু আমি নই—সঙ্গে আমার বোনও আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আপনি যান—যেমন করে পারেন দস্যুদের বাধা দিন। আমি চললাম অন্দর মহলে। [প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণরাম। পারবে—পারবে যুবক, এই হত্যাকাণ্ড থেকে নারীদের বাঁচাতে?

হিম্মত। পারব কি না জানি না, তবে জীবন দিয়ে চেষ্টা করব।

কৃষ্ণরাম। তবে যাও মহান যুবক! তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি বর্দ্ধমান রাজবংশের নারীদের সম্ভ্রম।

হিম্মত। আশীর্ব্বাদ করুন বর্দ্ধমান রাজবংশের পবিত্রতা রক্ষা করতে, বাংলার মান—বাঙালীর সম্মান রাখতে আমি যেন জীবন উৎসর্গ করতে পারি। [প্রস্থানোদ্যত] ভয় নেই মহারাজ! আপনার কাছে শপথ করে যাচ্ছি—বর্দ্ধমান রাজবংশের সব গেলেও সত্যবতীর নারীত্ব—সত্যবতীর সতীত্ব আমি যেতে দেব না। [প্রস্থান।

কৃষ্ণরাম। তুই আর দেরী করিস নে—এই ছদ্মবেশ পরে শীগ্‌গীর এখান থেকে চলে যা! [বস্ত্র দান]

জগত। কোথায় যাব? কেমন করে যাব? পালাতে তো কোনদিন শিখি নি বাবা।

কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণের কাছে যা—আর না হয় জাহাঙ্গীর নগরে নবাবের কাছে আশ্রয় নে? এগিয়ে গিয়ে দেখ্—নবাবের ছেলে আর কতদূরে! [নেপথ্যে :—রাজাকে পালাতে দিও না, বন্দী কর—বন্দী কর] ঐ সুভাসিংহ আসছে? আমাকে বন্দী করবে। জগত! আর দেরী করিস নে। আমি চললাম। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। যদি বাঁচি, আবার দেখা হবে। আর যদি মরি—

জগত। বাবা!

কৃষ্ণরাম। তাহলে দূর থেকে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিস। হিন্দুর গীতা আর মুসলমানের কোরাণ পাশাপাশি রেখে বাংলার মানুষকে ডেকে বলিস—ওগো হিন্দু! ওগো মুসলমান! তোমরা সাক্ষী থাক,—তোমরা বিচার কর। শতাব্দীর পরেও বাংলার বুকে যদি বর্দ্ধমানের এতটুকু স্মৃতিচিহ্ন থাকে, তাহলে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে দেখো—ইট-পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বুকের কঙ্কাল।

[প্রস্থান।

জগত। ওগো সূর্য্যদেব! অত জোরে হাসছ কেন? মুখ ঢাকো —আঁধার নিয়ে এস। রাজা কৃষ্ণরামের ছেলে আজ পালিয়ে যাচ্ছে —তোমার জলন্ত হাসি নিভিয়ে দাও।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ। অট্টহাসি। "কাজ শেষ···গুলি চালাও—বন্দী কর"]

জগত। কাজ শেষ? তবে কি—ভগবান! রক্ষা কর—রক্ষা কর—

টলিতে টলিতে রক্তাক্ত সৌবীর্য্যের প্রবেশ।

সৌবীর্য্য। কে ভগবানের কাছে করুণা চাইছ কে তুমি? পালিয়ে যাও—বর্দ্ধমানের শির ছিঁড়ে গেছে, দেহটাকে বাঁচাতে আর তুমি—

জগত। একি সেনাপতি? আপনি আহত।

সৌবীর্য্য। হাঁা হ্যাঁ! রাজকুমার! পালিয়ে যান—সব শেষ!

জগত। সব শেষ? তবে কি—

সৌবীর্য্য। মহারাজ নি—হ-ত!

জগত। নিহত? বাবা নেই? তবে আর পালাব না। বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জীবন দেব। [গমনোদ্যত]

সৌবীর্য্য। কুমার! কুমার!

জগত। না না—বাধা দেবেন না, আমি যাব—আমি যাব—

সৌবীর্য্য। রাজকুমার! মহারাজের শেষ আদেশ পূর্ণ করুন। পালিয়ে যান। এর পর হয়তো আর—

জগত। সেনাপতি!

সৌবীর্য্য। কথা শুনুন। আর দেরী করবেন না। আমি যাই—মহারাজের মরা দেহটা খুঁজে দেখি। জন্মের মত চলে যাচ্ছি। যাবার সময় একটু পায়ের ধূলো নিতে হবে—একটু আশীর্ব্বাদ নিতে হবে।

[প্রস্থান।

জগত। জন্মভূমির মর্য্যাদারক্ষায় সবাই গেল। এর পর হয়তো কৃষ্ণাও যাবে, রাজারামও যাবে। কিন্তু আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি যাচ্ছি পালিয়ে—না—না, কেউ শুনতে পাবে—শুনতে পাবে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

পল্লীপথ।

যুদ্ধের সাজে জবর খাঁর প্রবেশ।

জবর। ডাকছে! ডাকছে! বহিন আমাকে চিৎকার করে ডাকছে! এখান থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি তার ডাক! দাঁড়াও—দাঁড়াও বহিন্! আমি যাচ্ছি—কোন ভয় নেই। তোমাদের বাঁচাতে যদি আমাকে জীবন দিতে হয়, তাতেও আমি—আঃ—পথ যেন ফুরোতে চায় না! সৈন্যগণ! এগিয়ে চল। ওই দেখ বর্দ্ধমান-রাজপ্রাসাদ। এসে পড়েছি আর ভয় নেই।

হামিদ খাঁর প্রবেশ।

হামিদ। সাহাজাদা!

জবর। এস বন্ধু, তাড়াতাড়ি এস—আমরা বর্দ্ধমানের কাছেই এসে পড়েছি।

হামিদ। এসে পড়লেও বর্দ্ধমান এখন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

জবর। না না—কোথায় দূর? ঐ তো রাজবাড়ী দেখা যাচ্ছে।

হামিদ। দেখা গেলেও রাজবাড়ীতে আপনার যাওয়া হবে না।

জবর। হবে না? কেন?

হামিদ। বাংলার নূতন সুবেদার সম্রাট-পৌত্র আজিমওশানের আদেশ।

জবর। আদেশ!

হামিদ। এ বিদ্রোহ দমন করতে তিনি নিজেই যাবেন। যতক্ষণ না তিনি বর্দ্ধমানে পৌছান, ততক্ষণ আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবেন।

জবর। আমি তা'হলে—

হামিদ। আপনাকে ফিরে যেতে হবে।

জবর। ফিরে যাব?

আজিমওশানের প্রবেশ।

আজিম। হ্যাঁ নবাবজাদা! সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

জবর। হে বাংলার নূতন শাসনকর্ত্তা! এ আদেশ কি আপনার?

আজিম। না, দিল্লীর। আমার পিতামহ সম্রাট ঔরঙ্গজীব বলে পাঠিয়েছেন—এ যুদ্ধের জয়গৌরব আমাকেই নিতে হবে।

জবর। তাই নিন। সমস্ত ভার নিয়ে আপনিই এই বিদ্রোহ দমন করুন। জয়ের মালা আপনিই পরুন, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। শুধু আমার একটা অনুরোধ—আমাকেও সঙ্গে রাখুন সাহাজাদা।

আজিম। তা হয় না নবাবজাদা! তাতে সম্রাটকে অপমান করা হয়।

জবর। কিন্তু আমি যে বর্দ্ধমানের রাজকুমারকে কথা দিয়ে এসেছি!

আজিম। তোমার কথা আমি রাখব। বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে তোমার কাজ আমিই করব।

জবর। যদি এই যুদ্ধে আপনার পরাজয় ঘটে?

আজিম। নবাবজাদা!

হামিদ। দিল্লীর শক্তিকে সন্দেহ করা শুধু অন্যায় নয়—রাজ-দ্রোহিতা। দিল্লীকে উপেক্ষা করে আজ যদি আপনি বর্দ্ধমানে যান—

জবর। জলন্ত আগুনের কুণ্ড থেকে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা যদি রাজদ্রোহিতা হয়, তা'হলে সে রাজদ্রোহিতার শাস্তি আমি জন্ম জন্ম ধরে ভোগ করব, তবু হে রাজপুরুষ! বর্দ্ধমানের এতবড় সর্ব্বনাশ কাঠের পুতুলের মত নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না।

হামিদ। সাহাজাদার আদেশ অগ্রাহ্য করলে আমি আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হব।

জবর। বন্দী? না না—এতবড় ভুল করো না। ওদের তুমি চেন না ভাই। পাওনি ওদের পরিচয়। সত্য ওদের কাছে মিথ্যার বেসাতি—ধর্ম্মকে ওরা কবর দেয়—নারী ওদের খেলার পুতুল। দুনিয়ার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা সেখানে দোজাকের অন্ধকার টেনে আনে।

আজিম। এতদিন তবে কি করেছিলে? কেন বাংলার শাসন-কর্ত্তা চোখ বুজে এদের অত্যাচার সহ্য করে এসেছে? কেন দিল্লীতে খবর পাঠাও নি?

জবর। ও তর্ক এখন নয়—ও বিচার এখানে নয়। আগে বর্দ্ধমানের দিকে ছুটে যান। আজ দুদিন ধরে যুদ্ধ চলছে; দস্যুরা রাজবাড়ী ঘিরে রেখেছে। রাজভাণ্ডার লুঠ করছে। মেয়েদের ইজ্জৎ নিয়ে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আগে ওদের বাঁচান—

বিদ্রোহীদের বন্দী করুন। তারপর আমার আব্বাকে যে শাস্তি দিতে চান, মাথা পেতে নেব, আর হাসি মুখে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব আপনাকে জয়ের গৌরবে বরণ করতে।

আজিম। তবে চল হামিদ খাঁ! দেখে আসি কতবড় শয়তান সেই পাঠানদস্যু রহিম খাঁ, কতবড় অত্যাচারী সেই সুভাসিংহ—যাদের ভয়ে আজ বাংলার শিশু কাঁদে, মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে না! যাদের পায়ের শব্দে বাংলার মাটি কেঁপে ওঠে—ঘরের আলো নিভে যায়—দিল্লীর হুকুমকে অগ্রাহ্য করে যারা আজ বাংলার বুকে হাহাকার তোলে। হামিদ খাঁ! তাদের বুঝিয়ে দাও—বাংলার নবাব ঘুমিয়ে থাকলেও দিল্লীর শক্তি ঘুমিয়ে নেই, বুকের তাজা রক্ত নিয়ে মিটিয়ে দেবে তাদের রক্তের পিপাসা।

হামিদ। হ্যাঁ হ্যাঁ—রক্তের পিপাসা! মোগল-সৈন্য! হাতিয়ার খোল—ঝড়ের মত ছুটে চল। ঐ বর্দ্ধমান, ঐখানে জ্বলছে আগুন, ঐখানে ছুটছে রক্তের ফোয়ারা। চল—চল, আর দেরী করো না—দস্যুদের মুখোমুখি দাঁড়াও—ওদের নির্ম্মম অত্যাচারের জবাব দাও—দিল্লীর জবাব—মোগলের জবাব!

ছদ্মবেশে জগতরামের প্রবেশ।

জগত। কে গো! কে তোমরা? কিসের জবাব দিতে যাচ্ছ? সব ফুরিয়ে গেছে। বর্দ্ধমানের পরাজয়!

সকলে। পরাজয়?

জগত। শুধু পরাজয় নয়—রাজা কৃষ্ণরাম নি-হ-ত!

সকলে। নিহত?

জগত। [জবর খাঁকে] নবাবজাদা! এত দেরী করলে ভাই?

তোমার আশায় আমরা যে পথ চেয়েছিলাম। [জবর খাঁ লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।] একি! তুমি মুখ ফিরিয়ে আছো? তুমি কাঁদছো নবাবজাদা? না না, কেঁদো না! যদি পার—এখনও গিয়ে তোমার বহিন আর রাজারামকে উদ্ধার করে আনো।

আজিম। বহিন! রাজারাম!

জগত। আমার বোন—আমার ছোট ভাই রাজবাড়ীর মধ্যে আটক পড়েছে।

আজিম। তুমি কে?

জগত। বর্দ্ধমানরাজের ছেলে—জগতরাম।

আজিম। পালিয়ে এসেছ?

জগত। বাবার শেষ আদেশ। দস্যুরা রাজবাড়ী ঘিরে রেখেছে—লুটতরাজ করছে—সবাই নিহত। বেঁচে আছে এখনও আমার বোন আর ছোট ভাই; কিন্তু উদ্ধার করতে পারলাম না।

আজিম। কোন ভয় নাই। আমরা যাচ্ছি তোমার বহিনকে উদ্ধার করতে।

জগত। আপনারা?

হামিদ। দিল্লীশ্বরের পৌত্র—বাংলার নূতন শাসনকর্ত্তা সাহাজাদা আজিমওশান।

জগত। সাহাজাদা আজিমওশান? কিন্তু এত দেরী করলেন কেন? দস্যুরা হয়তো এতক্ষণ রাজবাড়ী লুঠ করে চলে যাচ্ছে।

আজিম। পথেই তাদের বন্দী করব। যাও হামিদ! সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাও। পথে যদি দেখা হয়, তাহলে পাঠান-দস্যুকে বলবে—বলবে বিদ্রোহী সুভাসিংহকে, যদি তোমরা সহজে সম্রাটের বশ্যতা

স্বীকার কর, তাহলে সাহাজাদা এখনও তোমাদের মার্জ্জনা করতে পারেন।

হামিদ। আর তা না হলে?

আজিম। বলবে তোমাদের মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। যাও।

হামিদ। সাহাজাদার হুকুম বান্দা জীবন দিয়েও পালন করবে। [গমনোদ্যত]

আজিম। আর শোন—সঙ্গে একজোড়া কয়েদীর বেড়ি আর তরবারিও নিয়ে যাও। বিদ্রোহীদের সামনে ফেলে দিয়ে বলবে—"বেছে নাও দস্যু! কি চাও? বন্দিত্ব না মৃত্যু?"

হামিদ। তবে চললাম সাহাজাদা। আপনার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সামনে তুলে ধরব কয়েদীর বেড়ি আর দিল্লীশ্বরের নাম লেখা সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার।

[প্রস্থান।

আজিম। তুমিও যাও রাজকুমার। আহত জীবনটাকে আরও ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখো—তোমাদের রক্তের দাম বৃথাই যাবে না। ব্যর্থ হবে না তোমাদের পরাজয়। দস্যু তোমাদের যা কেড়ে নিয়েছে—তা আবার ছিনিয়ে নেব—ফিরিয়ে দেব তোমার হাতে। অত্যাচারের চাবুক খেয়ে যারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, আবার তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে—ঘরে ঘরে আবার আনন্দের হাট বসবে—মহাদুঃখের শ্মশান-মঞ্চে আবার ফুটে উঠবে বেহেস্তের আলো।

[প্রস্থান।

জগত। ভাই! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কথা বলছো না কেন? তুমি যাবে না?

জবর। যাবার উপায় নেই দোস্ত। ওরা যে আমায় বেঁধে রেখে গেল। বুকের মধ্যে আমার কি ঝড় বইছে, তা আমি বোঝাই কাকে? কি দিয়ে তোমায় সান্ত্বনা দেব? কোন্ ভাষায় জানাব আমার কলিজার ব্যথা?

গীতকণ্ঠে দণ্ডধরের প্রবেশ।

দণ্ডধর।—

গীত।

ভাষা নাই—ভাষা নাই।
মাটির পৃথিবী কেঁদে হলো সারা কোথা তারে খুঁজে পাই।
চাঁদ হয়ে সে যে মোর ভাঙা ঘরে,
জোছনার মত পড়িত গো ঝরে,
সারা জীবনের ভালবাসা দিয়ে তারে আমি পেতে চাই।

জগত। এখনও তোমার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পার নি?

দণ্ডধর। না। কত খুঁজলাম—কত ডাকলাম—সারা বাংলা দেশ ঘুরে বেড়ালাম, কেউ তার খবর বলতে পারল না। বোধ হয় মরেই গেছে।

জগত। কি নাম তার বল তো?

দণ্ডধর। বিন্দুবাসিনী।

জগত। বিন্দুবাসিনী? ওরে পাগল! তাহলে সে মরে নি, এখনও বেঁচে আছে।

দণ্ডধর। আছে? কোথায়—কোথায়?

জগত। বর্দ্ধমান-রাজপ্রাসাদে। হাতিয়ার নিয়ে রহিম খাঁর সঙ্গে লড়াই করছে।

দণ্ডধর। লড়াই করছে? আমার বিন্দুবাসিনী রহিম খাঁর সঙ্গে হাঃ হাঃ হাঃ—কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি যাই—আমি যাই—[গমনোদ্যত]

জবর। কোথায় যাচ্ছ? মরবে যে।

দণ্ডধর। না না, মরব না। শুনলে না—আমার বিন্দুবাসিনী—বাংলার বউ পাঠানদস্যুর সঙ্গে লড়াই করছে? আমিও যাই, এক সাথে লড়াই করব, রহিম খাঁর মাথা নেব! [প্রস্থান।

জগত। তবে আমিও আবার যাই। সত্যবতী আমাকে ডাকছে, রাজারাম ছটফট করছে। বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে সবাই আর্ত্তনাদ করছে। [প্রস্থানোদ্যত]

জবর। [পথরোধ করিয়া] না না, তোমাকে যেতে দেব না। জলন্ত আগুনের গোলা থেকে তুমি যখন বেরিয়ে এসেছ, তখন আর তোমাকে ছাড়ব না।

জগত। আঃ—ছেড়ে দাও!

জবর। না। হয় তোমাকে নাবাব-বাড়ীতে থাকতে হবে, আর না হয় ছদ্মবেশে কৃষ্ণনগরে পালিয়ে যেতে হবে।

জগত। নবাবজাদা! সত্যবতী ডাকছে—রাজারাম ডাকছে! তাদের বিপদে ফেলে আমি কি পালিয়ে যেতে পারি? সত্যবতী! ওরে দাঁড়া। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

[জবরের হাত ছিনাইয়া প্রস্থান।

জবর। না না, ওকে ফেরাতে হবে। ওগো বর্দ্ধমান-রাজবংশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ফের,—স্বেচ্ছায় মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিও না।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বর্দ্ধমানের প্রাসাদ-অভ্যন্তর।

[নেপথ্যে কোলাহল]

দ্রুত সত্যবতী ও অর্পণার প্রবেশ।

অর্পণা। এস,—শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে পালিয়ে এস।

সত্যবতী। সত্য পরিচয় না পেলে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।

অর্পণা। পরিচয় দেবার সময় এখন নেই! শত্রুসৈন্য রাজবাড়ী ঘিরে ফেলেছে। এখুনি সুভাসিংহ এসে পড়বে।

সত্যবতী। আসুক সুভাসিংহ! মরতে হয় এইখানেই মরব—তবু তোমাদের সঙ্গে—

অর্পণা। এখনও সময় আছে—কথা শোন। তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি আর ছোড়দা অসাধ্যসাধন করেছি। এই চরম মুহূর্ত্তে আমাদের শেষ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিও না। চল—এখান থেকে পালিয়ে যাই।

সত্যবতী। পালিয়ে আমি কোথাও যাব না। যাও বোন! তোমরা আমার জন্য অনেক করেছ। কবচের মধ্যে লেখা চিঠির কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। তোমরা যেই হও, তোমার ছোড়দাকে বলো—"যদি দিন পাই, তাহলে এর বিনিময়ে"—

[নেপথ্যে কোলাহল—"বন্দী কর—দরজা ভেঙ্গে ফেল—দরজা"—]

অর্পণা। ঐ এসে পড়ল। রাজকন্যা!

সত্যবতী। কোন ভয় নেই। এস আমার সঙ্গে। [গমনোদ্যত]

অর্পণা। না না—ওদিকে যেও না। বিপদে পড়বে।

সত্যবতী। কিসের বিপদ? দেহে আমার আগুনের জ্বালা।

চোখে আমার আগুনের ফুল্‌কী। সামনে যা পাব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাব।

তরবারি হস্তে বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। সত্যবতী! সত্যবতী! পালিয়ে আয়। ফটক ভেঙে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বেদের বউ! শীগ্‌গীর সত্যবতীকে নিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি ফটকের সামনে।

অর্পণা। সুভাসিংহ কোথায়?

বিন্দু। তাকে দেখতে পেলাম না। শুধু রহিম খাঁকে—কিন্তু তুমি—তুমি কি বাঙ্গালী?

অর্পণা। সে কথা এখন থাক। তুমি সত্যবতীকে নিয়ে পালিয়ে যাও। আমি রহিম খাঁর সামনে যাচ্ছি।

বিন্দু। তাই কখনও হয়? রহিম খাঁর সামনে যাব আমি। আমার যে মানৎ আছে।

অর্পণা। কিসের মানৎ?

বিন্দু। রক্ত খাওয়ার মানৎ। রহিম খাঁকে মারব—তার রক্ত খাব,—তারপর সেই রক্তের আঁজলা নিয়ে আমি বাড়ী যাব। ভাঙা ভিটেয় রক্ত দিয়ে গোবর ছড়া দেব। সমাজকে ডেকে বলব—এই দেখ—ডাকাতের রক্ত নিয়ে এসেছি।

সত্যবতী। না না, রহিম খাঁর রক্ত ছুঁয়ো না। ও রক্তে বিষ মেশানো রয়েছে।

বিন্দু। তবু সে রক্ত আমার চাই। বিষ খেয়ে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দেব সমস্ত হিন্দুসমাজের বুকে

সত্যবতী। সে জ্বালার উত্তাপে সমাজকে তুমি নড়াতে পারবে

না। তার চেয়ে আমার হাতে তরবারি দাও। আমি যাচ্ছি ওদের সামনে। বাবা দাদা বাইরে যুদ্ধ করছে—আমি লড়াই করি ভেতরে—দুই দিক থেকে আগুন জ্বলে উঠুক। আর সেই জ্বলন্ত আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্ব্বংসহা সীতার মত সমস্ত বাংলাকে আর একবার দেখিয়ে দিই—ভারতের হিন্দু নারী হাসিমুখে আগুনের লেলিহান শিখা আলিঙ্গন করতে পারে, তবু সতীত্বের গায়ে এতটুকু কলঙ্কের দাগ দিতে পারে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। দিদি! দিদি! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সত্যবতী। কি—কি হয়েছে?

রাজারাম। ছাদের ওপর থেকে তীর ছুঁড়ছিলাম। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি—

সত্যবতী। কি দেখলি?

রাজারাম। ক'জন সৈন্য বাবাকে ঘিরে ধরেছে। বাবা প্রাণপণে যুদ্ধ করছে।

সত্যবতী। তারপর? তারপর?

রাজারাম। হঠাৎ বাবার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। অমনি একটা লোক ছুটে এসে—

সত্যবতী। ছুটে এসে?

রাজারাম। বাবার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিলে।

সত্যবতী। [চীৎকার করিয়া] রাজারাম! বাবা নেই?

অর্পণা। মহারাজ নিহত?

বিন্দু। রাজা শেষ?

রাজারাম। বাবা ঢলে পড়ল। দেখতে দেখতে সেখানকার মাটি রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। আমি আর তাকতে পারলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়লাম। [কাঁদিতে লাগিল]

অর্পণা। কেঁদ না ভাই! কাঁদবার সময় এখন নেই। আগে তোমার দিদিকে নিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়। শয়তানরা ভেতরে ঢুকেছে!

রাজারাম। তবে আয় দিদি! শীগ্‌গীর এখানে থেকে চলে আয়।

বিন্দু। যা যা সত্যবতী। আর একটুও দেরী করিস নে। কোন গোপন ঘরে লুকিয়ে থাক্‌। আর শোন্‌—এই ছদ্মবেশটা পরে চলে যা, নইলে কেউ দেখতে পাবে।

অর্পণা। যাও রাজকন্যা! তাই যাও।

সত্যবতী। তবে যাই, দেখি আঁধার ঘরে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারি। দাও, ছদ্মবেশ পরিয়ে দাও। [বিন্দু কাল কাপড়ে সত্যবতীকে বোরখার মত করিয়া পরাইয়া দিল] আয় রাজা! তাড়াতাড়ি আয়।

[রাজারামকে লইয়া প্রস্থান।

বিন্দু। চল বেদের বউ! আমরাও এগিয়ে গিয়ে দেখি—শয়তানরা কোন্‌ দিকে গেল।

অর্পণা। হ্যাঁ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল—"লুট কর—রাজভাণ্ডার লুট কর"—]

উন্মত্তের মত হাসিতে হাসিতে রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বন্দী কর—বন্দী কর। কাউকে পালাতে দিও না। কাজ শেষ! রাজা খতম—রাজার ছেলেটা নিখোঁজ—সেনাপতিটা

দম খেয়ে ঘুরে পড়লো মাটিতে। এইবার খুঁজে দেখ রাজভাণ্ডার কোথায়? লুঠ কর—সোনা দানা হীরে মাণিক যা যেখানে পাবে, সব লুট করে নাও।

সশস্ত্র সুভাসিংহের প্রবেশ।

সুভাসিংহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, লুঠ কর—লুঠ কর! কিন্তু দেখো খাঁ সাহেব! ঐ সঙ্গে যেন আমার রত্নটিকে লুঠ করে নিও না।

রহিম। পাঠান-সর্দ্দার কথার খেলাপ করে না দোস্ত! একবার যখন বলেছি, তখন বর্দ্ধমানের রাজকন্যা যত লোভনীয় হোক—রহিম খাঁ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সুভাসিংহ। কিন্তু তারা গেল কোথায়? রাজবাড়ীর মধ্যে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

রহিম। গা-ঢাকা দিয়েছে।

সুভাসিংহ। বল কি?

রহিম। আর না হয় তোমাদের রামায়ণের সীতার মত পাতালে ঢুকে পড়েছে।

সুভাসিংহ। তা'হলে আমিও পাতালে ঢুকে ধরিত্রীর মত ঐ সীতাকে গ্রাস করব।

রহিম। পারবে না দোস্ত! তোমার নসীবে বোধহয় রাজকন্যা জুটলো না।

সুভাসিংহ। জুটলো কি না, এখনি দেখতে পাবে। এস আমার সঙ্গে।

রহিম। কোথায়?

সুভাসিংহ। বাড়ীর মধ্যে ভাল করে খুঁজে দেখি

রহিম। আমার কাজ শেষ। এখন তোমার কাজ তুমিই কর।

সুভাসিংহ। রাজকন্যাকে পাবার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?

রহিম। যতটুকু করবার ছিল—করেছি।

সুভাসিংহ। রহিম খাঁ!

রহিম। চোখ রাঙিও না দোস্ত! আমাকে আলেয়ায় পেয়েছে। ভেতরের সমস্ত আঁধার কেটে গিয়ে সেখানে আলেয়ার আলো ঝলমল করছে। [গমনোদ্যত]

সুভাসিংহ। পাঠান-সর্দ্দার!

রহিম। সে আলো তুমি দেখনি দোস্ত! কিন্তু আমি দেখেছি। সে বেহেস্তের আলো। জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আমার ডাকাত-জীবনের সবকিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে পয়গম্বর বানিয়ে দিয়েছে। [পুনরায় গমনোদ্যত]

সুভাসিংহ। এ ধর্ম্মজ্ঞান এতদিন কোথায় ছিল?

রহিম। বুকের মধ্যে ঘুমিয়েছিল। আলেয়া তাকে নাড়া দিয়েছে। ভয় নেই দোস্ত! সে আলেয়া তুমিও দেখতে পাবে। মনে রেখো —বর্দ্ধমানের সাহাজাদীকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া দূরে থাক, এখন তাকে দেখতে পেলে জানাব আমার হাজার হাজার সেলাম— —সেলাম! [প্রস্থানোদ্যত]

সুভাসিংহ। দাড়াও খাঁ সাহেব!

রহিম। কেন?

সুভাসিংহ। অনেক জলে নেমেছি, এখন যদি ডুবতে হয় তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে ডুব্‌বো।

রহিম। তার মানে?

সুভাসিংহ। এই প্রাসাদের তলায় তোমাকে পুঁতে ফেলব—আর না হয় ঐ পাথরের দেওয়ালে তোমাকে গেঁথে রাখব।

রহিম। তা যদি পার, তাহলে বুঝবো বাংলার মাটি কোনদিন বিদেশীর পায়ে কলঙ্কিত হবে না—বাংলার মানুষ কোনদিন বিজাতির তাঁবেদার হবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

সুভাসিংহ। কোথায় চললে ?

রহিম। বর্দ্ধমানের রাজ-ভাণ্ডারটা খুঁজে দেখতে যাচ্ছি—রাজকন্যা বড়—না রাজার ধন-ভাণ্ডার বড়। দোস্ত! আদাব।

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। না না—তা হবে না। এ বেইমানি আমি সহ্য করব না। মনে রেখ পাঠান-দস্যু! রাজকন্যাকে যদি না পাই, তাহলে এ নরমেধ যজ্ঞের শেষ বলি দেব তোমা—ওকি! ওই না কারা ছুটে যাচ্ছে ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো রাজকন্যা। ছদ্মবেশে পালিয়ে যাচ্ছে। পেয়েছি—মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। দাঁড়াও রাজকন্যা! এইবার তোমাকে ধরা দিতেই হবে। [গমনোদ্যত]

দ্রুত বিন্দুবাসিনীর পুনঃ প্রবেশ।

বিন্দু। রাজকন্যাকে চাই ? রাজকন্যাকে চাই ?

সুভাসিংহ। হ্যাঁ, চাই। দিতে পার ?

বিন্দু। পারি। বিনিময়ে কি দেবে ?

সুভাসিংহ। তুমি যা চাও তাই দেব। বল—কি চাও ?

বিন্দু। রহিম খাঁর রক্ত।

সুভাসিংহ। রহিম খাঁর রক্ত ? তুমি কে ?

বিন্দু। আমি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি একটা জলন্ত আগুনের—না

না, আমি একটা মরা মানুষ। আগে ছিলাম গাঁয়ের কলাবউ, এখন হয়েছি রাজবাড়ীর রক্তখাগী ঝি।

সুভাসিংহ। রহিম খাঁর রক্তের বদলে তুমি রাজকন্যাকে আমার হাতে তুলে দেবে?

বিন্দু। দেব। একটা কেন—অমন দশটা নারীকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি যদি তুমি রহিম খাঁর রক্ত এনে দাও।

সুভাসিংহ। নারি! রাজার নুন খেয়ে তুমি এমন বেইমানি করবে?

বিন্দু। বাংলার নুন খেয়ে সুভাসিংহও তো একদিন বাংলার নারীকে রহিম খাঁর হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছিল।

সুভাসিংহ। নারি! তবে কি তুমি—

বিন্দু। আমিই সেই নারী। যাকে তোমার ভাই আর বোন রাতের আঁধারে তোমার বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল।

সুভাসিংহ। তবে আমার রক্ত না নিয়ে রহিম খাঁর রক্ত চাও কেন?

বিন্দু। তুমি যে বাঙালী—আর আমি যে সেই বাঙালীর মা।

সুভাসিংহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চল নারি! শুধু রক্ত নয় —আমি তোমাকে রহিম খাঁর মুণ্ড এনে দেখাব।

বিন্দু। দেখাবে? ঠিক বলছ রহিম খাঁকে তুমি হত্যা করবে?

সুভাসিংহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, রহিম খাঁর রক্ত দিয়ে তোমার দেহের সমস্ত দাগ মুছিয়ে দেব।

বিন্দু। তবে এস আমার সঙ্গে। রাজকন্যার বদলে রহিম খাঁর রক্ত! হাঃ-হাঃ-হাঃ—বেশ হবে! বেশ হবে! [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] ওই দেখ—ওই রাজকন্যা পালিয়ে যাচ্ছে। এস, ছুটে এস—

সুভাসিংহ। কাল কাপড়ে ঢাকা ওই রাজকন্যা?

বিন্দু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল বোরখা পরে ছুটে যাচ্ছে। এস, আর দেরী করো না।

[প্রস্থান।

সুভাসিংহ। চল—চল। কোথায় পালাবে রাজকন্যা? ধরা তোমাকে দিতেই হবে।   [প্রস্থান।

তীরধনুক হাতে দ্রুত হিম্মতের পুনঃ প্রবেশ।

হিম্মত। একি হলো! বিন্দুর হাত ধরে দাদা কোথায় যাচ্ছে? তবে কি ওই নারী রাজকন্যাকে ধরিয়ে দেবে? নরকের পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে এনে যাকে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম—সেই নারী আজ—না না, ওকে আমি বাঁচতে দেব না। নারী হয়ে ও যখন আর এক নারীকে দস্যুর হাতে তুলে দিতে চায়, তখন ওকে দুনিয়ার আলো বাতাস ভোগ করতে দেব না। [নেপথ্যে তীর নিক্ষেপ। দূর হইতে বিন্দুবাসিনীর আর্ত্তনাদ] যাও কালনাগিনি। এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। ওকি! দলবল নিয়ে রহিম খাঁ পালিয়ে যাচ্ছে? তবে কি রাজভাণ্ডার লুট করে—ও আবার কি? কাল কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কে ছুটে যাচ্ছে? পেছনে দাদা। ধরে ফেলেছে—ধরে ফেলেছে। তবে কি রাজকন্যা ধরা পড়ল? ওরে, কে আছিস? পাথর দিয়ে গড়া এই বাড়ীটাকে একটু নাড়া দে! এ কলঙ্ক চিরকালের মত মাটির তলায় তলিয়ে যাক।

[প্রস্থান।

রক্তাক্ত দেহে বিন্দুবাসিনীর পুনঃ প্রবেশ।

বিন্দু। ওরে! কে আমায় তীর মারলি? কে এমন সর্ব্বনাশ

করলি? আমি আর বেদের বউ যে মঙ্গল ঘট পেতেছি—বোধনের আগেই তা ভেঙে দিলি? রহিম খাঁর রক্ত দিয়ে আমার মানৎটা শেষ করতে দিলি নে? ভগবান! তুমি সাক্ষী রইলে। আমি যদি দোষ করে থাকি—আঃ···আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বেদের বউ! নিজের জীবন দিও—তবু রাজকন্যাকে দস্যুর হাতে তুলে দিও না। স্বামী! এ জন্মে আর দেখা হলো না,—আশীর্ব্বাদ কর—যেন পরজন্মে তোমার দেখা পাই।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা অর্পণাকে টানিতে টানিতে সুভাসিংহের প্রবেশ।

সুভাসিংহ। রাজকন্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—এতক্ষণে আমার আশা মিটলো —এতক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। এস—এস রাজকন্যা তোমার জন্য আমি—

ঝড়ের মত হিম্মতের প্রবেশ।

হিম্মত। দাদা! দাদা। ক্ষান্ত হও—এতবড় সর্ব্বনাশ করো না, —মাথায় তোমার বাজ পড়বে।

সুভাসিংহ। কে? হিম্মত? তুই এখানে কেন?

হিম্মত। দেখতে এসেছি রাজবাড়ীর চারিদিকে কতখানি আগুন জলেছে, আর সেই আগুনে চেতোয়ার জমিদার সুভাসিংহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কি না?

সুভাসিংহ। সুভাসিংহ ছাই হবার আগে সেই আগুনে বাংলা দেশটা পুড়ে যাবে।

হিম্মত। বাংলা দেশ পুড়বে না—পুড়বে আমাদের মুখ।

সুভাসিংহ। ঘরের কোণে বসে সে মুখ ঢেকে রাখিস।

হিম্মত। মুখ ঢেকে রাখলেও লজ্জা তো ঢেকে রাখতে পারব না।

সুভাসিংহ। শত্রুর দন্ত চূর্ণ করতে তোদের লজ্জা হতে পারে, কিন্তু আমার হয় না।

হিম্মত। পরের মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে তোমার লজ্জা না হতে পারে, কিন্তু আমার হয়।

সুভাসিংহ। তাহলে ভাই বলে পরিচয় দিস্‌নে।

হিম্মত। কিন্তু রক্ত যে পরিচয় দেয় দাদা! আজন্মের সম্বন্ধটা ঘুচিয়ে দিতে পারি—কিন্তু এক মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে রক্তের দাগটা তো মুছে দিতে পারি না। এই মেয়েটার মুখখানা খুলে দেখ—কি লেখা আছে ওর চোখের ভাষায়। কান পেতে শোন—কি মর্ম্মবেদনায় ভেঙে পড়ছে ওর আর্ত্তকণ্ঠস্বর। অন্তর দিয়ে বিচার কর—কত বড় নিষ্ঠুর সত্যকে আজ তুমি মিথ্যার মোড়কে ঢেকে রেখেছ।

অর্পণা। না না, আপনি বাধা দেবেন না। আমি তো স্বেচ্ছায় জমিদারের হাতে ধরা দিয়েছি।

হিম্মত। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছ ?

অর্পণা। হ্যাঁ। বাবার আদেশ ছিল—

হিম্মত। আদেশ ছিল ?

অর্পণা। বহুকালের বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলে আমি যেন—

হিম্মত। তুমি যেন ? বল বল—থামলে কেন ?

অর্পণা। সুভাসিংহকেই স্বামিত্বে বরণ করি।

হিম্মত। নারি !—

সুভাসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি বীরপুরুষ ? এখন বোধহয় ভাই বলে

পরিচয় দিতে লজ্জায় আর মুখখানা ঢেকে যাবে না? শোন রামভক্ত লক্ষ্মণ! একবার ক্ষমা করেছি—আজও করলাম। ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে—

হিম্মত। মাথাটা কেটে নিও, তবু তোমার পাপের সাক্ষী হয়ে নীরবে বেঁচে থাকতে পারব না। তোমার কাজের কৈফিয়ৎ আমাকেই দিতে হবে। যেমন করে দুর্য্যোধনের পাপের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল দুঃশাসনকে, যেমন করে বিভীষণকে দিতে হয়েছিল রাবণের জন্য, দারাকে দিতে হয়েছে ঔরঙ্গজীবের ময়ূর সিংহাসনের জন্য, ওগো নিষ্ঠুর! তেমনি করে. আমাকেও একদিন দাঁড়াতে হবে বাংলার কাঠগড়ায় তোমার পাপের জবাব দিহি করতে।

অর্পণা। তা যদি করতে হয়, আমরা করব,—কাঠগড়ায় যদি দাঁড়াতে হয়, আমরাই দাঁড়াব—তার জন্য আর কারও মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

হিম্মত। থাম—থাম কলঙ্কিনি। নারীত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি যে শেষে এমনি করে রাজবংশের মর্য্যাদা বিলিয়ে দেবে, বহু জন্মের সাধনা দিয়ে যে রত্ন তুমি পেয়েছিলে—সেই নারীত্ব যে এমনি করে লুটের হাটে বিক্রী করবে, তা জানা ছিল না।

অর্পণা। খবরদার! মনে রাখবেন আমি রাজকন্যা। বর্দ্ধমানের যতবড় বন্ধুই আপনি হোন—আমার মর্য্যাদা রেখে কথা বলবেন।

হিম্মত। রাজকন্যার মর্য্যাদা দিতাম তখন—যখন তোমার বাবার মত, দাদার মত তুমিও বুকের রক্ত দিয়ে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে। অথবা—

সুভাসিংহ। অথবা সুভাসিংহের হাতে জীবনটা বিলিয়ে না দিয়ে তার ভাই হিম্মত সিংহের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে।

হিম্মত। দাদা!

সুভাসিংহ। আমি যদি বলি আমার কাজে বাধা দিয়ে তুই আমার শিকার কেড়ে নিতে চাস?

হিম্মত। দাদা!

সুভাসিংহ। আমি যদি বলি এই অভিযানকে বানচাল করতে এসেছিস তোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য?

হিম্মত। চুপ কর—চুপ কর ওগো বাংলার মূর্তিমান কলঙ্ক! জিভটা তোমার খসে যাবে, মনুষ্যত্ব মাটি চাপা পড়বে। ধর্মের মন্দিরে আর কাঁসর ঘণ্টা বাজবে না। দেবতা মুখ ঢাকবে, প্রেতের তাণ্ডব লীলায় সমস্ত বাংলাদেশ ভরে যাবে, পৈশাচিক বর্ব্বর তার উন্মত্ত উল্লাসে সত্যের শঙ্খনাদ থেমে যাবে।

অর্পণা: যাক্, তবু আমি যাকে ভালবাসি তার হাতেই নিজেকে স'পে দিতে চাই। যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে।

হিম্মত। যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমাকে শেষ করে দিয়ে যাব।

সুভাসিংহ। তাহলে তোব রক্তে এখানে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

হিম্মত। যাক্, তবু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—[নেপথ্যে ধ্বনিত হইল:—তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর যুবক।"] হ্যাঁ হ্যাঁ—পূর্ণ করব। রাজা কৃষ্ণরাম রায়! তোমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষবে পালন করব। রাজকন্যা! [অগ্রসর]

সুভাসিংহ। হিম্মত!

হিম্মত। ঐ শোন রাজকন্যা, তোমার স্বর্গত পিতা আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। [অগ্রসর]

[নেপথ্যে—"নারীর সম্ভ্রম—নারীর সতীত্ব রক্ষা কর।"]

হিম্মত। নারীর সম্ভ্রম! সতীত্ব রক্ষা! রাজকন্যা,—

সুভাসিংহ। হিম্মত!

হিম্মত। ওঃ, পাপের অগ্নিকুণ্ড! পুণ্যের আহুতি! [অগ্রসর] না না—না—দেব না—আহুতি দেব না! [অর্পণার মস্তকে আঘাত করিল]

অর্পণা। আঃ—

সুভাসিংহ। তাহলে তোরও নিস্তার নেই। [হিম্মতকে হত্যায় উদ্যত]

রাজকন্যার বেশে সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। সুভাসিংহ! তুচ্ছ নারীর জন্য বাংলার একটা অমূল্য জীবন নষ্ট করলে? এস হাত ধর! আমিই রাজকন্যা!

সুভাসিংহ। তুমিই রাজকন্যা? তবে এ কে?

সত্যবতী। তোমারই বোন অর্পণা।—

সুভাসিংহ } অর্পণা।—
হিম্মত }

[হিম্মত তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশিনীর মুখাবরণ উন্মোচন করিল।
দেখা গেল অর্পণার মস্তক কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে]

হিম্মত। একি করলি? রাজকন্যাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনটা দিয়ে গেলি?

সুভাসিংহ। আঃ [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া] ওগো! বিস্মৃতিদায়িনী সুরা! মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভুলিয়ে দাও —আমি সেই সুভাসিংহ নই,—জ্বালিনি আমি বাংলার বুকে বিদ্রোহের আগুন,—আমিও মানুষ—আমারও দয়ামায়া আছে—কচিশিশুর মত আমিও কাঁদতে জানি—আমার চোখের জলে বাংলার মাটিও ভিজে যেতে পারে। [প্রস্থান।

হিম্মত। কাঁদো, কাঁদো হতভাগ্য! এ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যদি বিদ্রোহের আগুন না জ্বালতে, তুমি যদি বিদেশী দস্যুকে ডেকে এনে দাবানল সৃষ্টি না করতে, তুমি যদি নারীর নারীত্বকে নিয়ে এমনি করে ছিনিমিনি না খেলতে, তাহলে আজ তোমার মারণ-যজ্ঞে অর্পণাকে জীবন দিতে হতো না। রাজকন্যা! কেন তুমি ধরা দিলে?

সত্যবতী। শুধু তোমাদের বাঁচাতে। ওগো মহাপুরুষ! বৰ্দ্ধমানের একটা রাজকন্যা গেলে বাংলার কোন ক্ষতি হবে না; কিন্তু তোমাদের মত দুটি জীবন গেলে বাংলার বুকে এই আগুন আরও জ্বলে উঠবে। তখন কে ভরসা দেবে? কে শোনাবে আশার বাণী? ভয়ার্ত্ত মানুষের চোখে কে ফোটাবে আনন্দের হাসি? অন্ধকার ঘরে কে জ্বালাবে সন্ধ্যার প্রদীপ?

হিম্মত। কিন্তু তোমার জন্মটা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

সত্যবতী। ব্যর্থ হতে দেব না। অর্পণাকে বাঁচিয়ে তোল। দেখবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আবার রুখে দাঁড়াব। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা খুলে বাংলার বধূরা ছুটে আসবে, মেয়েরা কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, শত জীবনের লাঞ্ছিত পৌরুষ দিয়ে এই অত্যাচারের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

হিম্মত। তবে আমি অর্পণাকে মরতে দেব না। জীবনের মশাল জ্বালিয়ে আবার একে বাঁচিয়ে তুলব। দোরে দোরে গিয়ে বলব—এই নাও বাঙালি, তোমাদের জন্য আমরা আলো এনেছি। ধর এই আলোর পতাকা। গাও গান—আলো দাও—আলো দাও—[অর্পণাকে লইয়া যাইতেছিল]

সত্যবতী। অর্পণা!

হিম্মত। আলোর রথ—আলো—আলো—

[অর্পণাকে লইয়া হিম্মতের প্রস্থান।

সত্যবতী। আলো! ওগো, কত আলো! কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? রাজবাড়ীতে আলো কি সব নিভে গেল? না না, ঐ যে। আমার ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু কেন? অত আলো কেন? ফুলশয্যা হবে? বর্দ্ধমান রাজকন্যার ফুলশয্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—যাই, ভাল করে সাজি—ফুলশয্যা—বাসরশয্যা—সুভাসিংহের সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পল্লীপথ

মুসলমানবেশে চূড়াধর ও গুয়ের প্রবেশ।

চূড়াধর। ও গুয়ে! এ কোথায় এসে পড়লাম?

গুয়ে। তাইতো মামা! আমি তো ঠিক ঠাওর করতে পাচ্ছিনে।

চূড়াধর। এ তো আমাদের গাঁয়ের রাস্তা বলে মনে হচ্ছে না।

গুয়ে। তবে? এতদিন ধরে হেঁটে হেঁটে এ কোথায় এলাম?

চূড়াধর। এও যে সেই বর্দ্ধমান বলে মনে হচ্ছে।

গুয়ে। তাই নাকি? ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই বর্দ্ধমান?

চূড়াধর। বুঝলি গুয়ে! আমাদের ঠিক শালা পেঁচোয় পেয়েছে তা নইলে এত হাঁটছি—এদ্দিন বাড়ী পৌছবার কথা—আর ঘুরে ঘুরে শেষকালে কিনা—

গুয়ে। না মামা, পেঁচোয় পায়নি।

চূড়াধর। তবে?

গুয়ে। আমাদের 'এলেয়' ধরেছে।

চূড়াধর। ঠিক বলেছিস। ঐ শালা রহিম খাঁ বর্দ্ধমানের যুদ্ধে হয়তো খতম, কোথায় কোন ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছে—আর ব্যাটা দস্তিদানা হয়ে 'এলের' মত আমাদের ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

গুয়ে। তাহলে একটা কাজ করলে হতো না মামা?

চূড়াধর। কি কাজ?

গুয়ে। চল ঐ দামোদরের পাড়ে বসে শালার নামে একটা পিণ্ডি দেওয়া যাক।

চূড়াধর। দূর গাধা! মন্তোর নেই তন্তোর নেই—শুধু শুধু পিণ্ডি দিই—আর মাঠের শাল ঘুরে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসুক।

গুয়ে। তবে কি করবে? গাঁয়ে আর ফিরবে না নাকি?

চূড়াধর। তাই কখনো হয়? তোর মামীকে কতদিন দেখিনি বিরহে বুকখানা আমার ফেটে যাচ্ছে। ও শালা এলেয় ধরুক—আর পেঁচোয় পাক—পাক ঘুরতে ঘুরতে ঠিক বাড়ী গিয়ে পৌছব।

গুয়ে। তবে চল আর দেরী করো না। এবার অন্য রাস্তা দিয়ে রওনা হই, দেখি শালা রহিম খাঁ কি করতে পারে?

চূড়াধর। হ্যাঁ, তাই চল্। [উভয়ের গমনোদ্যোগ]

দরবেশ ফকিরের ছদ্মবেশে রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। [সুরে] আল্লা মেহেরবান। বলি, হ্যাঁ চাচা! তোমরা কি রাজবাড়ী থেকে আসছ? রহিম খাঁ এখন কোথায় বল্‌তে পার?

চূড়াধর। তুমি লোকটা কে মিঞা?

রহিম। আমি দরবেশ—ফকির। দেশে দেশে আল্লার নামগান করে বেড়াই।

চূড়াধর। তা আল্লার নামের সঙ্গে রহিম খাঁর নামটা মনে এলো কেন? যাবে নাকি সেখানে?

রহিম। খোদার যদি মর্জ্জি হয়, তাহলে যাব বৈকি।

চূড়াধর। তা যাও না একবার। দেখবে মজা! একধার থেকে সব কচুকাটা।

রহিম। ওতে আমার ভয় নেই। আমি হলাম দীনদুঃখী ফকির। রহিম খাঁ আমাকে কিছু বলবে না।

গুয়ে। ও ফকির-ফকোর মানব না। যাকে সামনে পাবে তাকেই অমনি ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্—

রহিম। থাম মিঞা, থাম। তোমাদের মত আমি নকল মুসলমান নই, একেবারে খাঁটি। আমার নাম শুনলে রহিম খাঁ তো থোড়াই—তার বাবা এসে আমার সামনে সালাম ঠুকে দাঁড়াবে।

চূড়াধর। ও, আমরা তাহলে নকল?

রহিম। শুধু নকল নও,—তার ওপর ভেজাল।

চূড়াধর। কি, ভেজাল? গুয়ে—না না থুড়, বাবা মানিকপীর! দেখাও তো তোমার খেলটা একবার। এই মুহূর্ত্তে ব্যাটাকে ভস্ম করে ফেল দেখি।

গুয়ে। তবে লাগ্ লাগ্ লাগ্! আমার মন্তোর ফকির সাহেবের দাড়ীতে গিয়ে লাগ্—চোখে মুখে লাগ্—আগুন হয়ে লাগ্—

চূড়াধর। কাট্ কাট্ কাট্—মন্তোর কটাৎ—

রহিম। ফাট্ ফাট্ ফাট্ হাড়ী ফটাৎ—

[রহিম খাঁ সহসা চূড়াধরের নকল দাড়ী ধরিয়া টান দিল। দাড়ী খুলিয়া গেল। রহিম খাঁ হাসিয়া উঠিল]

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চূড়াধর। দে-দে দেখ, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ফকির সাহেব! আমরা রাগলে কিন্তু যাচ্ছে-তাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

রহিম। কি যাচ্ছে তাই কাণ্ড হবে বাবা ভেজাল মুসলমান? [উভয়কে ধরিল]

উভয়ে। এই, ছেড়ে দাও বলছি। ভাল হবে না, ছেড়ে দাও বলছি—

রহিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাতিয়ার ও লোহার বেড়ি সহ হামিদ খাঁর প্রবেশ।

হামিদ। এই! এই! কে তোমরা?

চূড়াধর। আজ্ঞে, আমরা মানিকপীরের দরগা।

হামিদ। দরগা? তা এখানে মরতে এসেছ কেন?

চূড়াধর। এলোয় ধরেছে বাবা, এলোয় ধরেছে। আজ কদিন ধরে হরদম ঘুরপাক খাচ্ছি! চল্ গুয়ে! এই ফাঁকে সরে পড়ি।

গুয়ে। চল মামা! এও বোধ হয় রহিম খাঁর সাকরেদ!

[উভয়ের প্রস্থান।

হামিদ। আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে—

রহিম। ফকির। খোদার নোকরী করে বেড়াই।

হামিদ। কোথা থেকে আসছেন?

রহিম। বর্দ্ধমান থেকে।

হামিদ। বর্দ্ধমান থেকে? আচ্ছা বলুন তো বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর অবস্থা এখন কি?

রহিম। এক কথায় বর্দ্ধমান শেষ।

হামিদ। শেষ?

রহিম। রাজা নিহত।

হামিদ। নিহত?

রহিম। রাজপুত্র পলায়িত। বর্দ্ধমানের সাহাজাদী সুভাসিংহের হাতে বন্দী।

হামিদ। বন্দী?

রহিম। আর বাকী সব রাজবাড়ীর মধ্যে আটক পড়েছে।